পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নত্ত্ব-অধিকর্তা
পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত
আশুতোষ সংগ্রহশালার অধ্যাপক
সন্তোষকুমার বসু

লেখকের অন্যান্য রচনা

মধ্যদিনের গান

রহস্যময় মোহেন-জো-দড়ো

মহাসংগম

প্রতিবিম্ব

বাঘবন্দী

অজন্তার কথা

দিশাকাক

লম্বা লম্বা পা ফেলে হাওড়া ষ্টেশনে ঢুকলো দীপু। ঘড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে নিল। ঘড়িটা দেখে আশ্বস্ত হল সে। যাক, এখনো মিনিট দশেক সময় আছে তার হাতে। এ সময়ের ভিতর টিকিট কেটে ঠিক উঠে পড়বে ট্রেনে। তারপর আর তাকে পায় কে।

আসার সময় খুব ভয় পেয়েছিল সে। ভেবেছিল ট্রেন বুঝি আর ধরতে পারবে না। কি ভয়ানক ভীড় ছিল বাসে! কোন রকমে মাথা গলিয়ে ঠেলে-ঠুলে উঠতে পেরেছিল। এর-ওর ওপর দিয়ে গলে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল জানালার সামনে।

বাসটা যেন চলছিল পায়ে পায়ে। মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে পড়ছিল। রাস্তা মানুষে গিজ্ গিজ্ করছিল। দোকানগুলো ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় নেমেছে। বাস চলবে কোন পথে! ভয়ানক খারাপ লাগছিল দীপুর। এমনি দেরী হলে আর ট্রেন পেতে হবে না। ভণ্ডুল হয়ে যাবে সব। ব্যর্থ হবে অনেকদিনের তিল তিল করে গড়ে তোলা পরিকল্পনা। আজ বহু কষ্টে সে বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছে। অতগুলো লটবহর নিয়ে সবার চোখের আড়ালে বেরিয়ে পড়া সহজ নয়। কোথায় কে দেখে ফেলতো তার কোন ঠিক আছে?

সব মাটি হয়ে যেত। অমনি দীপুর মা ছুটে আসতেন। এসে সিঁড়ির মাথায় অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। বড় বড় চোখ দুটো দীপুর মুখে থাকতো স্থির হয়ে। তারপর একসময় ডুকরে কেঁদে উঠতেন।

মায়ের কান্না শুনে দীপুর বাবা ছুটে এসে গম্ভীর ভাবে বলতেন কি হল তোমার? হঠাৎ এ রকম কেঁদে উঠলে কেন? তারপর তাঁর চোখ যেত দীপুর দিকে। জিজ্ঞাসা করতেন, দীপু, তোমার হাতে এসব লটবহর কেন?

দীপুকে তখন চোরের মত দাঁড়িয়ে থাকতে হত। কি বলতো

সে? দীপুর মা আবার কেঁদে উঠতেন। বলতেন, ওগো, ওকে জিজ্ঞাসা কর এই দুপুর রোদে লটবহর নিয়ে কোথায় চলেছে। ও-বাড়ীর ছেলেটা সেদিন এমনি দুপুরে পালিয়ে গিয়েছিল। আর তার খোঁজ পাওয়া যায়নি। বাপ মায়ের কি হেনস্থা।

অবাক হয়ে যেতেন দীপুর বাবা। বলতেন, দীপু পালিয়ে যাচ্ছে! বলছো কি?

মা বলতেন, তুমি কি ছাই কিছু বোঝ না? কান্নায় তার স্বর জড়িয়ে যেত তখন। সারাদিন হিসাবপত্র নিয়ে থাকলে এমনি হয়। ছেলেটা কি করে কি খায় কোথায় যায় তার কোন খবর রাখ? মানুষ এমন হয়!

শুধু শুধু ও রকম কেঁদ না। কি হয়েছে বলবে তো, বলতেন দীপুর বাবা।

অবাক হতেন দীপুর মা। বলতেন, এখনো বুঝতে পারছো না! ও-বাড়ীর ছেলেটা পরীক্ষায় ফেল করেছে। কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে গেল। বোঝ কাণ্ড

এসব কথা বাসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দীপু ভেবেছে আর ঘেমেছে। যদি সে ট্রেন না ধরতে পারে খুব বিপদে পড়তে হবে। এই লটবহর নিয়ে কেমন করে বাড়ী ফিরবে? বাড়ী ফেরার সঙ্গে সঙ্গে দীপু ধরা পড়ে যাবে। আস্তে আস্তে সব ফাঁস হবে। আর কি কোন দিন সে বের হতে পারবে। জীবনের মত শেষ হয়ে যাবে তার স্বপ্ন।

পরের ট্রেন সেই রাত্রে। এতক্ষণ ষ্টেশনে বসে থাকা কি সহজ কথা। ওদিকে দীপুকে না পেয়ে তার বাবা খোঁজাখুঁজি শুরু করবেন। বাবা যদি দীপুর লিখে রেখে আসা চিঠি পেয়ে যান তা হলেতো সর্বনাশ হয়ে যাবে। দীপুর বাবা সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী ডাকবেন। চড়া গলায় হুকুম দেবেন চালাও হাওড়া। তীরবেগে ছুটবে গাড়ী। এসে দাঁড়াবে হাওড়া ষ্টেশনে। ঝট্ করে দরজা খুলে বেরিয়ে আসবেন দীপুর বাবা। সোজা ঢুকে পড়বেন ষ্টেশনের মধ্যে। এদিক ওদিক তাকাতেই দীপুকে পেয়ে যাবেন। লম্বা লম্বা পা

ফেলে কাছে এসে খপ্ করে হাতখানা চেপে ধরবেন। হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে তুলবেন গাড়ীতে। বাড়ী ফিরে কি আর কাউকে মুখ দেখাতে পারবে দীপু!

তখন তো সে আর বলতে পারবে না কেন বাড়ী থেকে পালিয়েছে। কি ভয়ঙ্কর এক স্বপ্ন তার বুকে বাসা বেঁধেছে। দিনের পর দিন ভেবেছে কেমন করে সে একাজ করবে। বাবার আলমারী থেকে মানচিত্র বের করেছে। অনেক খুঁজে বের করেছে শুশুনিয়া। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে সব। দেখেছে শুশুনিয়ায় যাবার পথ। এতবার দেখেছে যে মুখস্ত হয়ে গেছে তার। চোখ বুজেও বলে দিতে পারে পথের নিশানা।

দিনের পর দিন বই এনে পড়েছে। হাজার ভ্রমণ কাহিনী পড়েছে। পড়েছে ইতিহাস আর আবিষ্কারের কাহিনী। অধীত জ্ঞান প্রতি পদক্ষেপে কাজে লাগবে তার। মা টিফিনের পয়সা গুঁজে দিতেন হাতে। দীপু টিফিন খেত না। পয়সা জমাত। সে পয়সা জমিয়ে একটা একটা করে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনেছে। এনে লুকিয়ে রেখেছে। লুকিয়ে রেখেছে চিলে কোঠায়, কখনো আলমারির মাথায়। সব বৃথা হয়ে যাবে।

বাসটা যেন ভীড়ের ভিতর চলছিল ধীর গতিতে। দীপু রাস্তার পানে তাকিয়ে থেকেছে। দোকানে দোকানে ঝোলানো ঘড়িগুলো দেখেছে। কখনো ঘড়ির কাঁটা দেখে নিজেও ভয়ে কাঁটা হয়ে গেছে। আবার বিরক্তও হয়েছে। এক একটা ঘড়ির এক এক সময়। একটার সঙ্গে আর একটার সময়ের কোন মিল নেই। এরকম ঘড়ি যে কেন লোকে দোকানে ঝুলিয়ে রাখে বোঝে না দীপু। ঘড়ি থাকলেই হল—সময় মিলিয়ে রাখতে হবে না! দীপুর বাবা প্রতিদিন ঘড়ি মিলিয়ে নেন। রেডিওতে ঘণ্টা বাজলেই তার বাবার চোখ আপনি থেকে ঘড়িতে চলে যায়। ঘড়ি মিলে যায় কাঁটায় কাঁটায়। দীপুর মাকে তখন ডাক দেন। বলেন, কি গো এখনো দীপুকে তুলে দিলে না? ছ'টা বাজে। কখন পড়তে বসবে আর।

তবুও তার মা অভিযোগ করেন, কি ছাই কাগজপত্রে মুখ ডুবিয়ে রাখ। ছেলেটাকে একটু দেখতে পার না। ঐ তো একটি ছেলে আমাদের।

শুনে দীপুর বাবা হাসেন। বলেন, তুমি যে ভাবে সারাদিন ওকে আগলে রাখ—আমার সুযোগ কোথায়?

দীপুর মা বিরক্ত হন। বলেন, যা হোক মনে এলে অমনি বললে। আগলে আর কোথায় রাখছি। আমার তো ঐ একটিই ছেলে তাকে চোখে চোখে রাখবো না তো কাকে রাখবো। বাছা আমার লেখাপড়ায় ভাল। কথা শোনে। তাকে ভালবাসব না।

ভালবাসবে বৈকি, দীপুর বাবা তখন হেসে ফেলেন। বলেন, দীপুকে মানুষ করতে পারাই তো আমাদের প্রধান কাজ।

তখন দীপু মনে মনে ভাবতো অন্য কথা। মানুষ করছে! ছাই। দিনরাত এসব ভাল লাগে কারো। ওখানে যেও না ওটা কোর না, ওটা খেও না; এত নিষেধ ভাল লাগে না তার। কত ছেলেমেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদের ইচ্ছামত। কই, কেউ তো তাদের এমনি কথায় কথায় নিষেধ করে না। সবকিছুকে ভয় করে ঘরে বসে থাকলে চলে!

ঘরে বসে কোন কাজ কোনদিন হয়েছে? হয়নি। কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন। ঘরে বসে থাকলে তো আর হত না। অমনি অমনি হয় না কিছু। বড় কিছু করার পিছনে থাকে সাহস, বুদ্ধি, তীব্র ইচ্ছা। এ পথেই মানুষ একের পর এক আবিষ্কার করেছে। আবিষ্কারের ইতিহাস মানুষের সাহস আর রক্তঝরা কষ্টের কাহিনী। দুঃখ কষ্টকে জয় করে তবে হয়েছে। মৃত্যুভয়কে অস্বীকার করে মরুভূমি পেরিয়ে গেছে। গভীর অরণ্যে, মৃত্যুপুরীর অন্ধকারে পা দিয়েছে। হিমালয়ের তুষারের পথে অসংখ্য মৃত্যুর থাবাকে অগ্রাহ্য করে এগিয়েছে। তবেই না মানুষের করায়ত্ত হয়েছে তারা। এমনি করে পুষ্ট হয়েছে মানুষের জ্ঞানভাণ্ডার।

দীপু আপন মনে ভেবে চলেছে। পৃথিবীর দিকে দিকে মানুষ

কত কিছু আবিষ্কার করছে। আবিষ্কার করে দেশ ও দশের মুখ উজ্জ্বল করছে।

দু'শো বছর ছিল ভারতবর্ষ পরাধীন। সুযোগ সুবিধা ছিল না কিছু। শোষণে পঙ্গু হয়ে ছিল দেশ। তাই আবিষ্কারের ইতিহাসে তাদের নাম সবার পিছনে। কম বইতো পরেনি দীপু। কোথায় বাঙালীর নাম। কোথাও নেই! এমন করে আটকে রাখে বলেই না তারা কিছু করতে পারে না। কবিগুরু তাই দুঃখ করে বলেছিলেন : 'রেখেছো বাঙালী করে মানুষ করনি।'

বাবামাকে এসব কথা বলেনি দীপু। ঘুম থেকে উঠে কলতলায় গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে এসেছে। মুখ ধুয়ে চা খেয়ে পড়তে বসেছে। আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে। প্রতিজ্ঞা করেছে, অনেককিছু করার আছে যেগুলো আমাদের করতে হবে।

দীপুর বাবা দীপুকে অন্যমনস্ক দেখে বলেছেন, কি দীপু, কি ভাব যে সব সময় গম্ভীর হয়ে থাক ?

না—কিছু না। দীপু সংক্ষেপে জবাব দিয়ে সরে পড়েছে। কি দরকার তার সঙ্কল্পের কথা বাবাকে বলার। দীপুর বাবা দীপুর কথা শুনে হাসবেন। বলবেন, দীপু তুই পাগল হলি! এসব কি ছেলে-মানুষের কাজ? কত বড় বড় পণ্ডিত রয়েছেন। এসব তাঁরা করবেন।

হাসতে হাসতে তিনি দীপুর মাকে ডাকতেন। বলতেন, শুনেছো দীপুর কথা। দীপু বলে, ও মানুষ আবিষ্কার করবে।

মানুষ! দীপুর মা অবাক হতেন। বলতেন, মানুষ আবার আবিষ্কার করার মত কিছু নাকি! বোকা ছেলে। আমরা সবাই তো মানুষ। এতে আবার আবিষ্কার করার কি আছে।

—না—না, বলতেন দীপুর বাবা। বলতেন, তুমি বুঝতে পারছো না। ও পৃথিবীর প্রথম সময়কার মানুষদের আবিষ্কার করবে। যারা লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে জন্মেছিল।

—ওমা, দীপুর মা অবাক হয়ে বলতেন, তারা কি আজো বেঁচে আছে! দীপুর পানে তাকিয়ে বলতেন, পাগল ছেলে, তাদের

তুই পাবি কোথায়? তারা কি তোর জন্যে বসে আছে?

—কি পাগলের মত বকছো, দীপুর বাবা ধমক দিতেন। তুমি ছাই কিছু বোঝ না। মানুষগুলো খুঁজবে কেন? সেই দূর অতীতের মৃত মানুষদের হাড়, মাথার খুলি আর তারা যে অস্ত্র ব্যবহার করতো সেগুলো এখানে ওখানে পড়ে আছে, তারা অতীতে যেখানে বাস করত তার আশেপাশে। দীপু সেগুলো সব খুঁজে বের করবে। কথা বলতে বলতে দীপুর বাবা হাসতে থাকেন।

দীপুর মা তখন বলতেন, তাই কি হয়! এই পৃথিবীর কোথায় কখন মানুষ জন্মেছে তার কি কিছু ঠিক আছে! তুই দু:ধের বাচ্চা এসবের কি বুঝবি। দীপুর পানে তাকিয়ে বলতেন, টেবিলে ছানা রেখে এসেছি। যাও, খেয়ে নাও গিয়ে।

দীপু তাদের কিছু বলে নি। তাই বলে সে তার প্রতিজ্ঞা ভুলে যাবে! তাড়াতাড়ি মায়ের কাছে চলে গেছে। কি জানি আবার যদি বাবা জিজ্ঞাসা করেন, কিরে দীপু কি ভাবছিস?

তবে দীপুকে সত্য কথাই বলতে হবে। তার চাইতে বাবার সামনে থেকে সরে পড়াই ভাল। মায়ের কাছে চলে গেছে দীপু। মায়ের কাজ দু'একটা হাতে হাতে করে দিতে গিয়েছে। মা বলেছেন তখন, থাক, থাক, তোকে কষ্ট করতে হবে না। বসে বসে দেখ।

দীপু সোজা টিকিট বিক্রির কাউণ্টারে চলে যায়। হ্যাঁ, এখানেই তো টিকিট বিক্রি হয়। লাইন দিয়ে অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। এমনি করেই তো ট্রেনের টিকিট কাটতে হয়। বাবা মায়ের সঙ্গে সীমুলতলা বেড়াতে যাবার সময় দেখেছে। বাবা তখন তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কেন মানুষ লাইনে দাঁড়ায়। তাতে কি কি সুবিধা।

দীপু সবার পিছনে দাঁড়িয়ে পড়ে। সামনে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা পর পর টাকা ভিতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। অমনি টিকিট পেয়ে যাচ্ছে। দীপু ঘড়ি দেখে আর ভগবানকে ডাকে। হে ভগবান পায়ে পড়ি ঘড়িটাকে একটু আস্তে করে দাও। আমি যেন ট্রেন ছাড়ার আগেই টিকিট পাই।

এক এক করে দীপুর পালা আসে। টাকা কাউণ্টারে ঢুকিয়ে দিয়ে জায়গার নাম বলে সে।

কাউণ্টারে বসে থাকা ভদ্রলোক অবাক হয়ে যান। বলেন, তোমাকে কে টিকিট কাটতে পাঠালো। ষ্টেশনের নাম বলবে তো।

দীপু বিপদে পড়ে যায়। হায়, এখানে এই হাওড়া ষ্টেশনেই সব কিছু শেষ হয়ে যাবে নাকি। লোকটা কি রকম কট্‌মট্‌ করে তার দিকে তাকিয়ে আছে। বুঝতে পারলো নাকি? বুঝতে পেরেছে হয়তো, দীপু পালিয়ে এসেছে।

ভদ্রলোকের বুঝি মায়া হয় দীপুকে থতমত খেয়ে যেতে দেখে। বলেন, ও গ্রামে তো রেল ষ্টেশন নেই। রেল ষ্টেশন দু' মাইল দূরে। ষ্টেশনে নেমে গরুর গাড়ী করে যেতে হয়। ষ্টেশনের নামটাও বলে ফেলেন ভদ্রলোক।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ ষ্টেশনের টিকিটই তো আমার চাই, দীপু বলে। নামটা ভুলে গিয়েছিলাম কিনা, তাই বলতে পারিনি।

ভদ্রলোক আর কথা বাড়ান না। যা ভীড় কাউণ্টারে। টিকিট দিতেই কত পরিশ্রম হয় তার। ঝক্কি পোয়াতে হয় কত। একজনের সঙ্গে একটু কথা বললেই পিছনের জন রেগে যায়। মুখিয়ে ওঠে। এক মিনিট দেরীতে বিশ্বসংসার যেন উল্টে যাবে।

দীপু টিকিট নিয়ে কাউণ্টার থেকে তাড়াতাড়ি সরে যায়। আবার ঘড়ি দেখে। না, এখনো পাঁচ মিনিট হাতে আছে। কতটুকুই বা পথ। ঐ তো দেখা যাচ্ছে ট্রেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধোঁয়া উগরোচ্ছে।

দীপু পায়ে পায়ে এগিয়ে যায়। টিকিট চেকারের পাশ দিয়ে ভিতরে ঢোকে। হাতের মুঠোয় টিকিট ধরা। টিকিট চেকারকে গেটে টিকিট দেখাতে হবে তো, তাই।

দীপুর কাছে কিন্তু টিকিট চাইলো না টিকিট চেকার। হয়তো ছেলেমানুষ বলে টিকিট চাইবার কথা ভাবেনি। ভেবেছে বড় কেউ সঙ্গে আছে সে টিকিট দেখাবে। দীপু পায়ে পায়ে গিয়ে ট্রেনের একটা কামরায় উঠে পড়ে। মনে মনে হাসে খুশীর হাসি।

দীপুর মা বলেন' দীপু একা যেও না। তুমি না ছোট। কই, ছোট বলে তার কিছুতে আটকালো? সব দীপু জানে, সে সব করতে পারে। বাবা মা শুধু শুধু ভয় পেয়ে তাকে আটকে রাখেন। এর কোন মানে হয়!

দীপুর মনে পড়ে সীমুলতলার একটা ঘটনা। সে বাবার সঙ্গে এখানে ওখানে গিয়েছে। একবার ধারারা গিয়েছিল গরুর গাড়ী করে। আজো তার মনে আছে ধারারাকে। কান পাতলে আজো সে শুনতে পায় জলের পাখোয়াজ সঙ্গত। গুম্-গুম্ করে যেন বেজে চলেছে। সাদা মারবেল পাথরের উপর দিয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। পাক খাচ্ছে ফেনার রাশি। চোখ বুজলে আজো পরিষ্কার দেখতে পায় দীপু।

ধারারাকে কোন দিন ভুলতে পারবে না দীপু। ভাবতে বসলেই বুকের ভিতর আজো পাখোয়াজ বেজে ওঠে। ধারারা না গেলে পৃথিবীতে জানবার বুঝবার এত বড় খবরটা পেতোই না দীপু।

গরুর গাড়ীতে বসে'ছিল তারা। ছাতি পাহাড়ের পাশ দিয়ে বাঁক খেয়ে নলডাঙ্গার বাড়ির মাঝখান থেকে একটু এগোলেই বটগাছ। নিচে কালো পাথরের চাঁই, সিঁদুর লেপা। তার পরেই পাহাড়। পাহাড়ের পর পাহাড়। যেন অসংখ্য গজরাজ যুগ যুগ ধরে বসে আছে সারি সারি। আর তাদের মাঝখান থেকে পথ চলেছে এঁকেবেঁকে।

গাড়ীর বাইরে বসেছিল দীপু। কি ভাল লাগছিল তার। কোন মানুষ নেই। নীরব নির্জন পথ। মাঝে মাঝে চোখে পড়ে দু'একটা নাম না জানা পাখী। বড় কোন গাছ নেই। পাহাড়ের কোল ঘেঁষে এঁকেবেঁকে চলেছে রাস্তা। রাস্তা যেন মায়াবী ময়াল সাপের মত পাক খেয়ে দূরের পাহাড়ে হারিয়ে গেছে। ঐ বাঁকের আড়ালেই আছে সেই রূপকথার দেশ। যেন কত যুগ ধরে রাজকুমারী ঘুমিয়ে আছে যাদুকর দৈত্যের যাদুতে।

গরুর গলায় ঘন্টা বাজছিল ঠুন্ ঠুন্ করে। দীপুর মনে হয়েছিল

এই পথে এমনি করে সে যুগ যুগান্ত গরুর গাড়ীতে বসে আছে। দিনের পর দিন তাকে নিয়ে এগিয়ে চলছে গাড়ী। কিন্তু কোন দিন পৌঁছবে না সে রূপকথার রাজ্যে। রূপকথার রাজ্যের বাঁকটা যেন ক্রমশই দূর থেকে দূরে সরে যায়। কেন যে যায় দীপু তা জানে না।

সারাদিন ধারারায় ছিল তারা। দীপুর মা ষ্টোভে মাংস রান্না করেছেন। দীপু তার বাবার হাত ধরে পাথর বেয়ে উপরে উঠেছে। উপরে উঠে দেখেছে ধারারার দুই দিক। কেমন নদীর বুক বেয়ে বালি ঠেলে ঠেলে এগিয়ে আসছে জল। ধারারার মুখে আটকে যাচ্ছে পাথরে। জল লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। পাথর ডিঙিয়ে নেমে যাচ্ছে উল্টো দিকে। গম্‌গম্ আওয়াজ উঠছে—যেন বেজে চলেছে হাজার হাজার পাখোয়াজ।

জলের মাথায় সূর্যের আলো। চিক্ চিক করে ওঠে—ঝলসে ঝলসে ওঠে রুপালী মাছের মত। কখনো মনে হয় জল যেন অভ্রের দানা হয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে। বড় বড় পাথর অতিকায় হাতীর মত যেন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। কোনটা হাতীর দাঁতের মত সাদা। কোনটা নিকষ কালো। কি মসৃণ! দীপু হাত রাখতেই হাত পিছলে গেছে।

ওখানকার একটা লোকের সঙ্গে আলাপ করেছিল দীপুর বাবা। ধারারার উপরেই একটা বাঘের গুহা আছে। লোকটা বলেছিল 'বাঘকান্দুন'। 'বাঘকান্দুন' কথাটার অর্থ বুঝতে বেশ কষ্ট হয়েছিল দীপুর বাবার।

দীপুর বাবা বাঘের গুহা দেখতে গিয়েছেন। জেদ ধরেছে দীপু, সেও যাবে। দেখবে কেমন দেখতে 'বাঘকান্দুন'।

দীপুর বাবা বিরক্ত হয়েছেন। বলেছেন, সব কিছুতেই বায়না ধর কেন দীপু! এমন করে অবাধ্য হতে হয়।

তবু দীপু ছাড়েনি তার বাবাকে। কান্না পেয়েছিল দীপুর। এত কাছে এসেও বাঘের গুহা না দেখেই ফিরতে হবে দীপুকে।

দীপুর বাবা হেসেছেন তার ছেলেমানুষী জেদ দেখে। হেসে বলেছেন, আয়, তোকে নিয়ে আর পারা যায় না বাপু।

দীপুকে উপরে তুলতে খুব কষ্ট হয়েছে তার বাবার। কয়েকটা খাড়াই পাহাড় টপকে যেতে হয় গুহাটার কাছে। কি বিশ্রী একটা গন্ধ আসছিল গুহার ভিতর থেকে। ভয় পেয়েছিল দীপু।

সঙ্গের লোকটি উপরে উঠে বলেছিল, ভয় পেয়ো না খোকাবাবু, সব সময় কি বাঘ থাকে। আগে এখানে ঘন জঙ্গল ছিল। তখন বাঘটা থাকতো। এখন তো আর জঙ্গল নেই বাঘটাও তাই আসে না।

দীপু তখন ভাবছিল অন্য কথা। সত্যি যদি এই সময় বসে থাকতো গুহায়। সিহরিত ভাবনায় দীপুর সারা শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠেছিল। সে তো আর কম বাঘ শিকারের কাহিনী পড়েনি। কি ভয়ঙ্কর অরণ্যের এই জীবটি। কখন যে কার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বে কেউ জানে না।

গুহাটা ঠিক একখানা ঘরের মত। মেঝেতে চওড়া একখানা পাথর বিছানো। দু'পাশের খাড়া পাথর প্রায় মসৃণ। উপর দিক থেকে এক খানা অমসৃণ পাথর এগিয়ে এসেছে ঝুল বারান্দার ছাদের মত সামনের দিকে। দেখলে মনে হয় যেন একখানা একচালা দোকান ঘর। সামনের ঝাপ খুলে রেখেছে।

দীপুর বাবা জায়গাটা দেখে খুশী হয়েছিলেন। বলেছিলেন, কি চমৎকার। এখানটায় বাঘটা শুয়ে থাকতো। নদীর অনেক উপরে এ গুহাটা। কিন্তু সহজেই ডান দিক দিয়ে লাফিয়ে নিচে নেমে যাওয়া যায়। বাঘটাকে বিচক্ষণ বলতে হবে।

সঙ্গের লোকটি দীপুর বাবার কথা শুনে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়েছে। বলেছে, দেখছেন না এখান থেকে নদীর দুটো দিক পরিষ্কার দেখা যায়।

—ঠিক, দীপুর বাবা সমর্থন করেছেন। বলেছেন, বাঘটা খুব ভাল জায়গা বেছে নিয়েছিল মানতেই হবে। বনের পশুরা নদীতে জল খেতে আসতো। এখানে বাঘটা তাই লক্ষ্য রাখতো। কাউকে

জলে মুখ দিতে দেখলে নিঃশব্দে এখান থেকে নেমে যেত। তুলে নিয়ে আসতো জানোয়ারটাকে মুখে করে।

দীপু তখন আর তাদের কথা শুনছিল না। সে গুহার ভিতর ঢুকে পড়েছে। ভিতর থেকে দু দিকের দৃশ্য বড় ভাল লাগছিল তার।

কিন্তু বেশি সময় সে দেখতে পায়নি এ দৃশ্য। চীৎকার করে উঠেছিলেন দীপুর বাবা—এ কি দীপু, তুমি ভিতরে চলে গেছ! শিগ্‌গির বেরিয়ে এস পাথরের খাঁজ থেকে। কোথায় কি লুকিয়ে আছে বলা যায়? বিছে টিছে থাকতে পারে। এখানকার কয়েত সাপ ভয়ানক বিষাক্ত। তোমার একটুও বুদ্ধি নেই।

ভয় পেয়ে বাইরে বেরিয়ে এসেছে দীপু। এসে দাঁড়িয়েছে বাবার গা ঘেঁষে।

লোকটা দীপুর মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়েছে। বলেছে ছেলেমানুষ। অত বকবেন না।

—কি বলছেন মশায়, আঁৎকে উঠেছেন দীপুর বাবা। কি দরকার ওর ভিতরে যাওয়ার। কখন কোন বিপদ ঘটবে বলতে পারে কেউ?

গুহটা খুব ছোট নয় বলছে সঙ্গের লোকটি। ঐ যে ভিতরে গর্ত দেখছেন ওটা অনেক দূরে চলে গেছে। ও মুখটা দিয়ে সহজেই একটা লোক ভিতরে ঢুকে পড়তে পারে।

নিশ্চয় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হবে, বলেছেন দীপুর বাবা।

ঠিক তাই, বলেছে লোকটি। খানিকটা গেলেই গুহাটা বড় হয়ে যায়। তিন চারটে মানুস সোজা হয়ে হাঁটতে পারে এত বড়। ওর ভিতরেই ঘুমাতো বাঘটা। তখন মুখটা খুব বড় ছিল। কয়েক বছর আগে ভূমিকম্পে পাথর খসে পড়ে মুখটা ছোট হয়ে গেছে।

অবাক হয়েছে দীপু। ইচ্ছে হয়েছে গুহার ভিতরে ঢুকতে। সে ছোট, কত সহজেই না ভিতরে ঢুকতে পারবে। পিছনে পিছনে ঢুকবে তার বাবা। তারা দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে জ্বেলে দেখবে গুহার ভিতরটা। কি মজাই না হবে।

সব দেখে তবে গুহার বাইরে আসবে। মাকে গিয়ে বলবে সব।

দীপুর মা তখন আপশোষ করবেন। বলবেন, আহা, আমায় একটু নিয়ে গেলি না। আমিও দেখে আসতাম গুহার ভেতরটা। দেখতাম গুহার ভেতরটা কেমন দেখতে।

কোলকাতায় গিয়ে দীপু বলতো তার বন্ধুদের। বলতো, গুহার ভিতরে ঢুকেছিলাম আমরা। কত বড় গুহা। আর কি অন্ধকার। বন্ধুরা তখন দীপুর মুখের পানে হাঁ করে তাকিয়ে থাকতো। বিশ্বাস করতেই চাইতো না।

—বাবা, ভিতরে যাব না? ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করেছে দীপু।

—ভিতরে যাবি! দীপুর বাবার চোখ দুটো যেন কপালে উঠে গিয়েছিল। বলেছিলেন, তুই ডাকাত নাকি দীপু। চল, চল দেখি তোর মা কি করছে। তোকে নিয়ে কোথাও যাবার যো আছে!

দীপুর বাবা দীপুকে নামিয়ে এনেছেন। দীপুর ভয়ানক খারাপ লেগেছিল। কান্না পেয়েছিল তার। সারা পথ মুখ গোমড়া করে বসেছিল সে। পড়ন্ত বেলায় সূর্যাস্তের পটভূমিকায় পাহাড় কেমন দেখায় তা দেখার কথাও মনে আসে নি তার। বসে বসে আপন মনে আপশোষ করেছে। ঐ গুহাটার ভিতরে কি আছে কে জানে! এমন তো হতে পারে যে, ঐ গুহার দেয়ালে দেয়ালে শিল্পী সাজিয়ে গুছিয়ে এঁকে রেখেছে নানা রকম ছবি।

দীপু পড়েছে গুহাচিত্রের একখানা বই। প্রায় চল্লিশ হাজার বছর আগের মানুষ ছবি এঁকেছে। ছবি এঁকেছে আমাদেরই মত। সে হ'ল মানুষের হাতে শিল্পের জন্ম নেবার সময়। আদিম মানুষ একদিন পাহাড়ের দেয়ালে ছবি এঁকেছে। দুর্ভেদ্য গুহার অন্ধকারে দিনের পর দিন তারা ছবি এঁকেছে। এক একটা গুহা এত দুর্ভেদ্য যে ভিতরে ঢোকাই যায় না। হয়তো মাথা নীচু করে, কখনো হামাগুড়ি দিয়ে, কখনো শুয়ে আদিম শিল্পী সেই গুহার ভিতরে ঢুকেছে। তারপর দেয়ালে দেয়ালে এঁকেছে ছবি। গাছের ডাল থেতো করে তৈরী করেছে তুলি। পাথর ঘসে তৈরী করেছে রং। তাতে মিশিয়ে নিয়েছে চর্বি। তারপর সেই রং দিয়ে এঁকেছে ছবি।

সেই ছবি এক একখানা বিরাট। ঘোড়ার ছবি আসল ঘোড়া থেকে অনেক বড় করে আঁকা। তারা ম্যামথের পর্বতের মত দেহ এঁকেছে, এঁকেছে হিংস্র বাইসন। গুহার গা বেয়ে চলেছে হরিণের সারি। সেসব ছবি দেখতে হয়েছে অদ্ভুত। জীবন্ত পশুর দল যেন মিছিল করে চলেছে। কোথাও তারা ছুটছে দল বেঁধে। হরিণের সারি আসছে ঝরনার জল পেরিয়ে।

আবার আছে আহত পশুর ছবি। আদিম মানুষের পাথরে তৈরী বর্শায় বিদ্ধ হয়ে মরণ যন্ত্রণায় ছটফট্ করছে। আছে পাথরে খোদাই করা মূর্তি। মাতৃকা মূর্তি। আহত বাইসনের মূর্তি। কোথাও বা ভল্লুক—আরো কত কি।

এসব ছবি এঁকেছে শিল্পী অন্ধকার গুহার গভীর প্রান্তে। শিল্পীর সঙ্গীরা প্রদীপ ধরে পাশে দাঁড়িয়ে থাকতো। প্রদীপের টিমটিমে আলোতে রহস্যময় হয়ে উঠতো গুহার দেয়াল। তা থেকেও রহস্যময় মনে হত বোধহয় আদিম যুগের শিল্পীকে।

গুহাচিত্র পাওয়া গেছে ফ্রান্সে, ইটালীতে, স্পেনে। বিশ্ববিখ্যাত ফ্রান্সের আলতামিরা গুহাচিত্র। অনেকে আজকাল এসব ছবি দেখতে যায়। গিয়ে অবাক হয়। অবাক হয়ে ভাবে কেমন করে এত স্বল্প আলোতে এত বড় ছবি এঁকেছে সে যুগের শিল্পীরা!

বইটাতে আছে ভারতবর্ষের গুহা চিত্রের কথা। গুহায় পাওয়া গেছে অনেক ছবি। কিন্তু ছবিগুলো খুব বেশিদিন আগের আঁকা নয়। ছবিগুলোও তেমন ভাল নয়। গুণগত মূল্য সামান্য।

বইটা পড়তে পড়তে ভয়ানক রাগ হয়েছিল দীপুর। কে বলেছে প্রাগৈতিহাসিক কালে ভারতবর্ষের গুহায় আঁকা হয়নি মূল্যবান ছবি? এমনতো হতে পারে সুন্দর ছবি আঁকা গুহাগুলো এখনো রয়েছে সবার অজ্ঞাতে।

কে বলতে পারে দীপুর দেখা এই গুহাটি তেমনি মূল্যবান নয়। গুহার বর্ণনা শুনে তেমনি মনে হয়েছে দীপুর। দীপু তো জানে, যে সব গুহায় ছবি আঁকা আছে সে সব গুহায় ঢোকার পথ কত সংকীর্ণ।

এ গুহাটাও তো তেমনি। আহা, দীপু যদি ভিতরে যেতে পারতো। হয়তো দিয়াশলাইয়ের কাঠির আলোতে ঝলসে উঠতো দেয়ালে আঁকা অসংখ্য ছবি।

দীপু শহরে গিয়ে সবাইকে বলে দিত। খবর পেয়ে পণ্ডিতরা সব ছুটে আসতেন। এসে দেখতেন ছবি। অবাক হয়ে যেতেন তাঁরা। প্রমান হ'ত গুহা চিত্রের ইতিহাসে ভারতবর্ষ পিছিয়ে নেই। আর এত বড় খবর আবিষ্কার করেছে দীপু।

ভাবতে ভাবতে আছন্ন হয়ে পড়েছিল দীপু, কখন যে পথ শেষ হয়েছে খেয়াল হয়নি তার। হঠাৎ গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়াতে খেয়াল হয়েছে। ততক্ষণে তারা পৌঁছে গেছে শিমুলতলা।

সারা রাত ঘুমাতে পারেনি দীপু। কতবার ভেবেছে বাবার টর্চ নিয়ে পালিয়ে যায় সে। একা একা চলে যায় ধারারা। তারপর গুহার ভিতরে ঢুকে পরে। আবিষ্কার করে আসে ছবি আঁকা একটি গুহা। তখন তার বাবা অবাক হয়ে যাবেন। আর কোন দিন বলবেন না, দীপু ওখানে যাস্‌নে। দীপু, তুমি মায়ের হাত ছেড়ে দিচ্ছ কেন? কোথায় পড়ে যাবে কিছু ঠিক আছে।

পরের দিন বিকেলে গিয়েছিল অমিয় বাবুর বাড়ী। দীপুর বাবার বন্ধু। কি সুন্দর মানুষটি। দীপুর সঙ্গে আলাপ করেছেন। নিজে হাতে করে রসগোল্লার প্লেট এগিয়ে দিয়েছেন।

দুটো রসগোল্লা খাওয়ার পরেই দীপুর মা দীপুকে সাবধান করে দিয়েছেন। বলেছেন, বেশি খেও না। তোমার তো জিভে আড় নেই বাপু। বিদেশ বিভুঁই, একটা কিছু হলে কি বিপদে পড়তে হবে তোমার বাবাকে।

অমিয় বাবু ধমক দিয়েছেন দীপুর মাকে। কি বলছেন আপনি! ছেলে মানুষ ওরা খাবে নাতো কারা খাবে? খুব খাবে আর ছোটা ছুটি করবে তবেই না জোয়ান হয়ে উঠবে।

দীপুর মা লজ্জা পেয়ে চুপ করে গেছেন। আর কোন কথা বলেন নি। অমিয় বাবু দীপুর কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকানি দিয়েছেন।

বলেছেন দীপুর চোখে চোখ রেখে, খাবে, খুব করে খাবে আর দৌড়োবে। তোমাদের কাছে দেশ কত কিছু আশা করে।

অমিয় বাবুর কথা শুনে দীপুর বাবা হেসেছেন। বলেছেন, ওর পালোয়ান হবার কোন ইচ্ছা নেই। ওর হ'ল মানুষের ইতিহাস আবিষ্কার করার ইচ্ছা। বলতে বলতে হো হো করে হেসে উঠে ছিলেন দীপুর বাবা।

তাই নাকি। অমিয় বাবু মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেছেন। বলেছেন, শুনে খুব খুশী হয়েছি। তুমি যদি বড় আবিষ্কারক হও আমরা আরো খুশী হব। তোমাকে নিয়ে গর্ব করবো আমরা।

লজ্জা পেয়ে নিজের ভিতর কুঁকরে গেছে দীপু। তার বাবা কি। এমনি করে সবার কাছে সব কথা বলতে আছে।

অমিয় বাবু কাছে ডেকে নিয়েছেন দীপুকে। বলেছেন, আদিম মানুষদের সব পরিচয় এখনো পাওয়া যায়নি। প্রাগৈতিহাসিক ইতিকথার নানান জায়গায় বড় বড় ফাঁক আছে, সে ফাঁক পূর্ণ করা দরকার। কিন্তু তথ্য চাই প্রমাণ চাই। তার জন্য দরকার আরো আবিষ্কারকের। তুমি বড় হয়ে এসব ফাঁক পূর্ণ-করবে দীপু।

দীপুর বাবা তখনো হাসছিলেন। হাসতে হাসতে বলেছেন, ধারারা থেকে ফিরে এসে দীপু খুব বিমর্ষ হয়ে আছে। ধারারার ওপরটায় একটা গুহা আছে। গুহার মুখে উঠেছিলাম আমরা। দীপু আমার সঙ্গে ছিল। গুহার মুখটা খুব ছোট। সঙ্গের লোকটি বললো শুয়ে ভিতরে ঢোকা যায়। ভিতরটা নাকি বেশ বড়। চারটে লোক চলতে পারে। আধ মাইলের বেশি লম্বা।

আর কি বলেছিল ? অমিয় বাবু আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

গুহাটার ভিতরে নাকি শিব আর নাগ আছে, বলেছেন দীপুর বাবা। আরো কি সব যেন বলছিল লোকটি। ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। শিবের মত কোন পাথর আছে বোধহয়। হয়তো সাপটাপও থাকতে পারে।

অমিয় বাবু দীপুর বাবাকে সমর্থন করেছেন। বলেছেন, পাথর

খয়ে খয়ে এমন এক এক সময় দেখতে হয় যে অবাক হয়ে যেতে হয়। হলুদ বর্ণায় একখানা পাথরের চাঁই পরে থাকতে দেখেছি। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন একটা গণ্ডার মাথা নীচু করে জল খাচ্ছে।

এ লোকটা নিজের চোখে কিছু দেখেনি, বলেছেন দীপুর বাবা। জীবিত এমন কারো খবর লোকটা জানেনা যে গুহার ভিতর ঢুকেছে। এ নাকি ওর ঠাকুরদার মুখে শোনা গল্প।

হ্যাঁ, এখানটায় নানারকম গল্প প্রচলিত আছে, অমিয় বাবু বলেছেন। এ রকম গল্প আমি অনেক শুনেছি।

দীপুর বিশ্বাস, ঐ গুহার দেওয়ালে অনেক ছবি আঁকা আছে। দীপুর বাবা হাসতে হাসতে আরো অনেক কথা বলেছেন। বলেছেন, ও গুহা চিত্রের ওপর একটা বই পড়েছে। এমন একটা গুহার মুখে গিয়েও গুহা চিত্র আবিষ্কার করা হ'লনা ভেবে দুঃখ পাচ্ছে।

অমিয় বাবু তখনো গম্ভীর হয়েছিলেন। বলেছিলেন এখানে গুহাচিত্র পাওয়া যাবে কেন! এটা খুব পুরনো মানব বসতির জায়গা নয়। অবশ্য খুব যে একটা অনুসন্ধান হয়েছে তা নয়। জানেন তো আমাদের দেশের উদাসীনতা।

দীপুর বাবা চুপ করে ছিলেন।

অমিয় বাবু আবার বলেছেন, হিমালয় খুব একটা প্রাচীন পর্বত নয়। বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে একেবারে সেদিনের ঘটনা। বলতে পারেন খোকা পাহাড়। বরং সাতপুরা রেইনজের পাহাড় খুব পুরাণো। বলতে পারেন একেবারে আদ্দিকালের পাহাড়। দিনে দিনে পাহাড়টা মাটিতে বসে গেছে। আর ওদিকটায় হিমালয় উপরে উঠেছে।

খুব মজার ব্যাপার তো, বলেছেন দীপুর বাবা। পৃথিবীতে কত কিছুই না জানার আছে।

অমিয় বাবু হেসেছেন। বলেছেন, গুহমানব যাকে বলে তা থাকতে পারে ঐ সাতপুরা, শুশুনিয়া, বিন্ধ্য পর্বত এসব এলাকায়। মানুষের ধাপে ধাপে এগোনোর যে ইতিহাস এর বেশি মাল-মশলাই পাওয়া গেছে ইউরোপে। কিছু পাওয়া গেছে আফ্রিকা আর

ভদ্রলোক বলেন, খোকা তোমার সঙ্গের লোকজন কোথা?

—একাই যাচ্ছি। ভারিক্কী চালে বলে সে।

—সেকি! যেন বিশ্বাস করতে পারেন না ভদ্রলোক।

দীপু বুঝতে পারে সে ভয়ানক ভুল করে ফেলেছে। বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছে বুঝতে পেরেছে লোকটি। তাই এমন খুটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে তাকে। বাবা মা স্টেশনে থাকবেন। দীপু নিজে থেকেই কৈফিয়ৎ দেয়। ট্রেন থেকে নেমে তাদের সঙ্গে চলে যাব।

—তুমি বাঁকুড়ার ছেলে? আবার বুড়ো ভদ্রলোক প্রশ্ন করেন। তোমার কথায় তো বাঁকুড়ার টান নেই। এক এক জায়গার লোক এক এক টোনে কথা বলে।

ঘাবড়ে যায় দীপু। সত্যিই তো। তাদের বাড়ীতে আছে নিধুদা। দীপুর বাবার সব কাজ কর্ম করে দেয়। এইতো বছর দুই কাজে লেগেছে। প্রথম যখন আসে তখন বলতো, 'যাতিছি'। বলতো, 'দাঁড়ান বাবু, সব হবে খনে।'

দীপুর ভয়ানক হাসি পেত। দীপুর হাসি দেখে খেপে যেত নিধুদা। বলতো, আবার হাসতে নেগেছে। হ, কনকাতার ভাষা আবার শিখতে নাগে।

—বাঁকুড়ার লোক হব কেন? খুব আশ্চর্য হবার ভান করে বলে দীপু। আমি কোলকাতার লোক। কোলকাতায় আমাদের বাড়ী আছে। বাবা বাঁকুড়ায় চাকরী করেন কিনা।

বটে বটে, বুড়ো লোকটি মাথা নাড়েন। কোথায় কাজ করেন তোমার বাবা?

কেন, ষ্টেশনে, দীপু সহজ ভাবে বলে। মনে মনে ভাবে ভারী মুশকিল হলতো। হাজারটা মিথ্যে কথা বলা যায়! তার বাবা ঠিক কথাই বলেন। কত দিন বলেছেন, দীপু কখনো মিথ্যে কথা বোল না। দেখবে একটা মিথ্যে ঢাকতে কত মিথ্যে কথা বলতে হয়। সেটা কি খুব বিপদজনক নয়? ক'টা মিথ্যে কথা বানিয়ে বানিয়ে বলতে পারে মানুষ! তাই শেষ পর্যন্ত ধরা পড়তেই হয়।

আর কোন কথা বলেননা বুড়ো মানুষটা। ঘুম পেয়ে গিয়েছিল বুঝি। জানালার গায়ে মাথা হেলিয়ে দেন। চোখ বোজেন।

ঝাঁ ঝাঁ করে ট্রেন ছোটে। আওয়াজ ওঠে ঘটাং ঘটাং। দীপু জানলার কাছে বসা। হু হু করে হাওয়া আসছে। কি মিষ্টি হাওয়া। দীপুর খুব ভাল লাগে। তাকিয়ে থাকে। হুট হুট করে চোখের সামনে দিয়ে সব দৃশ্য সরে যায়। দেখতে না দেখতে হারিয়ে যায় বাগান পুকুর ক্ষেত। হঠাৎ ঝলসে ওটে সরষে ক্ষেতের হলুদ ঝলকানি। পর মুহূর্তে পিছিয়ে যায় সবুজ কলা বন।

দেখতে দেখতে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ে দীপু। হু হু করে ট্রেন ছুটে চলেছে। স্বপ্ন দেখে দীপু। সে একের পর এক পাথর বেয়ে কখনো মাড়িয়ে চলেছে। সামনে তো কোন রাস্তা নেই। চড়াই উৎরাই পেরিয়ে চলেছে সে। তৃষ্ণা পেয়েছে তার। গলা শুকিয়ে যেন কাঠ হয়ে গেছে। কোথাও জল পাচ্ছে না। তৃষ্ণায় তার ছাতি যেন ফেটে যাচ্ছে। একটা ঝরণাও চোখে পড়ছে না তার।

আশায় আশায় এগিয়ে চলছে দীপু। সঙ্গে যে-সব খাবার এনেছিল তা নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন খিদেয় কষ্ট হচ্ছে তার। নাড়ী ভুড়ি যেন মোচর মারছে ক্ষুধার তাড়নায়। আর পা চলছেনা দীপুর। চড়াই উৎড়াই ভেঙ্গে ভেঙ্গে হাঁটু ফুলে উঠেছে। থেকে থেকে টাটায়। পা যেন আর এগোতে চায় না।

সামনে কিছু নেই। শুধু পাথর। যেন প্রেত পুরীর নিস্তব্ধতায় তারা মৃত হাতীর মত দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছে প্রতি পদে দীপুকে বাধা দেওয়ার জন্য। কি কঠিন নিষ্ঠুর এই পাথরের সীমাহীন বিস্তার। এর বুঝি কোন শেষ নেই। দিনের পর দিন হেঁটে যাও। শুধু পাথর আর পাথর। পাথর মৃত প্রহরী হয়ে দাঁড়িয়ে অছে।

চোখ ঝাপসা হয়ে আসে দীপুর। একটু জল, একটু জল পাবে না সে? পৃথিবীর সাত ভাগইত হ'ল জল, আর তার জন্য এক গ্লাস জল নেই!

মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে দীপুর। পা তার কাঁপছে। মাথা আর

চীনে। কিন্তু ভারতবর্ষে যা পাওয়া গেছে তার পরিমাণ সামান্য।

দীপুর বাবা তখন দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, আমাদের ভারতবর্ষ অনেক বিষয়েই পিছিয়ে আছে।

খুব দুঃখের কথা, বলেছেন অমিয়বাবু। আমার ধারণা প্রস্তর যুগের মানুষের অনেক ইতিহাস আমাদের বাংলা দেশেই আছে। বাংলাদেশকে বলা হয় পলিমাটির দেশ। পূর্ববঙ্গ সম্বন্ধে একথা খাটে। কিন্তু বাঁকুড়া কি উত্তর বঙ্গ এসব জায়গা হ'ল খুব প্রাচীন। এখানে মানুষ ছিল না, এ হতেই পারে না। আমার ধারণা শুশুনিয়ায় খুঁজলে সেই যুগের মানুষের পরিচয় পাওয়া যাবে।

এমন ধারণা আপনার কেন হল, দীপুর বাবা জানতে চেয়েছেন।

আমি শুশুনিয়া দেখেছি, বলেছেন অমিয়বাবু। আমার ধারণা ব্যাপক অনুসন্ধান করতে পারলে ওখানে অনেক অজ্ঞাত তথ্য আমরা পেয়ে যেতে পারি। কিন্তু কে করছে বলুন। কথা বলতে বলতে দীপুকে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। বলেছেন এদের আশায় পথ চেয়ে বসে আছি। নিশ্চয়ই এরা একদিন এ কাজ করবে।

দীপুকে বলছেন, কি পারবে না শুশুনিয়া থেকে আদিম মানুষের পরিচয় আবিষ্কার করতে?

দীপুর বুক তখন উত্তেজনায় কাঁপছিল। কথা বলতে পারছিল না আর। শুধু মাথা নেড়ে জানিয়ে দিয়েছিল সে পারবে।

হো হো করে হেসে উঠেছিলেন দীপুর বাবা। দীপুর মাও হেসেছিলেন। ভয়ানক খারাপ লেগেছিল দীপুর। সব সময় তার বাবা মা তাকে ছোট করে দেখেন। দীপু তুমি এটা পারবে না। দীপু ওটা তুমি করতে যেও না। বললেই হ'ল। কে জানে দীপু পারবে না! দীপু মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে সে বড় হয়ে শুশুনিয়া যাবে। আবিষ্কার করবে প্রস্তর যুগের মানুষের ইতিহাস।

সবাই বলে ভারতবর্ষের বাইরে থেকে এসেছে এখানে মানুষ। তারাই সৃষ্টি করেছে সভ্যতা। কেন? বিবর্তনের পথে এই ভারত ভূখণ্ডে জন্ম হতে পারে না মানুষের? আর নিশ্চয় ছিল তাদের

পাথুরে যুগের একটা সভ্যতা। ক্রমে সেই মানুষ জীবন সংগ্রামের পথে পাল্টে পাল্টে গেছে। তাদেরও একটা সমাজ ছিল। তারাও কোন পাহাড়ের গুহায় বাস করতো। দীপু জানে এসব কথা খুব সহজ নয়। চাই পাথুরে প্রমাণ, প্রমাণ চাই প্যালেলথিক যুগে এখানে মানুষ ছিল সংখ্যার হিসাবে লক্ষ লক্ষ বছর আগের কথা।

দীপু কম বই পড়েনি। তাদের স্কুলের মাষ্টার মশাই দিয়েছেন। বলেছেন মন দিয়ে পড় দীপু আস্তে আস্তে সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। পুরনো দিনের ইতিহাস খুঁজে বের করা খুব সহজ নয়। কেউ তো আর তাদের ইতিহাস লিখে রাখেনি। রেখে যায়নি যত্নে তাদের ব্যবহার করা কোন অস্ত্র। সব পড়ে থেকেছে অবহেলায়। মহাকাল ধীরে ধীরে গ্রাস করেছে।

তবু কিছু কিছু উপাদান পাওয়া যায়। তাদের ভুক্তাবিষ্ট পশুর হাড় কখনো তাদের ব্যবহার করা পাথুরে অস্ত্র। নয়তো ব্যবহার করা হাড়ের সূচ। পাথরে পাথর ঘষার দাগ। মেয়েদের গলায় ঝোলানো পশুর দাঁতের মালা। —এরকম নানা টুকিটাকি উপাদান। এসব যে পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে কোথায় পড়ে আছে তা জানা খুব সহজ নয়।

তা থেকেও কঠিন সেগুলো বিচার বিশ্লেষণ করে আসল সত্য বের করে আনা। বিজ্ঞানের নানা শাখায় দখল থাকা চাই। তবেইনা সম্ভব। কিন্তু ছোট বয়স থেকেই এর জন্য তৈরী হতে হবে।

মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছে দীপু। ভেবেছে তাকেও একটা বড় কাজ করতে হবে। নয়তো তার বাবার চোখ খুলবে না। সে ছোট, সে সব কিছু পারবে না, শুনে শুনে দীপুর কান যেন পচে গেছে। কেন সে পারবে না। সে কি কম বড় হয়েছে?

ট্রেনের কামরার এক পাশে বসে থাকে দীপু। পাশের লোকটি তাকিয়ে আছে তার মুখের পানে। মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করে, খোকা কোথায় যাবে?

ফস করে জায়গাটার নাম বলে দীপু।

ঘুমের মধ্যে সে স্বপ্ন দেখেছে, স্বপ্ন দেখেছে 'পিথাকেনথ্রোপাস' মানুষের স্বপ্ন। যারা লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীতে জন্মেছিল। জন্মে লড়াই করেছে বাঁচার জন্য। বাস করেছে গুহার নিরাপদ নিভৃত গহ্বরে। তারাই প্রথম পাথর ঘষে ঘষে অস্ত্র তৈরী করা আবিস্কার করেছে। হয়তো পাথর দিয়ে পাথরে ঘা দিয়ে পাথরের পাত খষিয়েছে। অনেক পরিশ্রমে তৈরী হয়েছে সামান্য ধারওয়ালা পাথুরে অস্ত্র। ঐ স্থূল অস্ত্র দিয়ে ছোটখাট জীবজন্তু শিকার করেছে। নরম কাঁচা মাংস চিবিয়ে চিবিয়ে খেয়েছে। হয়তো দুর্বোধ্য ভাষায় তারা কিছু কথাবার্তা বলতে পারতো।

চা-চা-গরম-চা চাই। লোকটি তেমনি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে চীৎকার করছে।

দীপু চা চায়। লোকটি এগিয়ে এসেও একটু ইতস্তত: করে। দীপুর সঙ্গে কে আছে কে পয়সা দেবে সেটা বোধহয় বুঝে নিতে চায়। কি ভেবে চা দেয়। দীপু পয়সা দিয়ে চায়ে ঠোঁট ছোঁয়ায়। ভয়ানক বিস্বাদ চা। দীপু অবাক হয়। এ কেমন চা। সে তো তার মায়ের হাতে তৈরী চা খায়। সেই চা খেতে কত ভাল লাগে। আবার খেতে ইচ্ছে করে দীপু ভাবে এই তো সবে শুরু। যে কাজে নেমেছে তাতে পায়ে পায়ে বাধা। কত কষ্ট করতে হবে তাকে।

ট্রেন এগিয়ে চলে। দীপু বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। ভাবে কি ভয়ঙ্কর রকম বড় এই পৃথিবী। তার কতটুকুই বা সে দেখেছে। কোলকাতার সব জায়গা যাওয়া হয়নি তার। না জানা রয়েছে কত কিছু। সে কিছুই জানে না। কিছুই সে শেখেনি। একটা মানুষ সারা জীবন বসে মানুষের অধীত জ্ঞানের কতটুকু জানতে পারে? অথচ মানুষের কাছে পৃথিবী আজো কি ভয়ানক অজানা। কেমন করে মানুষ মানুষ হ'ল সে কথাটাই পুরো জানা হয়নি তার।

ডারউইন সাহেব বলেছেন বিবর্তনের কথা। আবহাওয়া ও পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে জীবজন্তু নিজেকে ধীরে ধীরে পাল্টে নেয়। নয়তো প্রতিকূল পরিবেশে তার অপমৃত্যু অবশ্যম্ভাবি।

তাই তারা নিজেকে ধীরে ধীরে পাল্টে নেয়। লক্ষ লক্ষ বছর এমনি করে পাল্টায়। পাল্টে পাল্টে বানরজাতীয় কোন জীব বনমানুষ হয়ে যায়। আবার কেউ কেউ মানুষ হয়। নিশ্চয়ই আজকের মানুষ নয়। বানরের কাছাকাছি মানুষ। তারাও বাঁচার তাগিদে আবহাওয়ার পরিবর্তনে পাল্টে পাল্টে যায়। পাল্টে পাল্টে অজেকের মানুষ হয়।

এর কতটুকুই বা মানুষ জানতে পেরেছে। কিন্তু আশার কথা সে চেষ্টা করেছে। সব কিছু জানবার বুঝবার চেষ্টা না করলে কি মানুষ আজ রকেট সভ্যতায় পৌঁছত।

মানুষ আজ গ্রহান্তরের পথে ছুটেছে। প্রকৃতির সব নিষেধের বেড়াজাল ভেঙ্গে চাঁদ বুড়ির দেশে দিয়েছে হানা। এর শুরু হ'ল সেই পাথর ঘষা আরম্ভ করা থেকে। তখনকার মানুষদের পক্ষে আজকের পৃথিবীর কল্পনা করতে পারার প্রশ্নই আসে না। তখনকার মানুষের কল্পনা শক্তি ছিল দুর্বল।

দীপুর খেয়াল হয় সামনের বুড়ো মানুষটির ঘুম ভেঙ্গেছে। দীপুর পানে তাকিয়ে আছে। পলক পড়েনা যেন তার চোখে। অমন করে বুড়ো মানুষটি কি দেখছে!

সারা মুখ দাড়ি গোঁফে ঢাকা। ঘিয়ে রঙের খদ্দেরের পাঞ্জাবী। পা তুলে বসে আছে ভদ্রলোক। থেকে থেকে পান চিবোচ্ছে।

দীপুর ভয় হয়। ছেলে ধরা নয়তো! খপ করে নাকের কাছে একখানা রুমাল ধরবে। একটু মিষ্টি গন্ধ। ব্যস্, হয়ে গেল। ঝিম ঝিম করতে থাকবে মাথা। তার পর ঘুমে ঢলে পড়বে। তখন ঐ বুড়োর দলের আর সবাই আসবে। কোন একটা ষ্টেশনে নামিয়ে নেবে দীপুকে। আটকে রাখবে জনমানবহীন কোন এক পরিত্যক্ত বাড়ীতে। দীপুর বাবার কাছে চিঠি যাবে। হাজার টাকা নগদ দাও তোমার ছেলেকে ফিরে পাবে। নয়তো—

ভাবতেই শিউরে ওঠে দীপু। ভাবে সামনের ষ্টেশনে হুট করে নেবে যাবে। উঠবে গিয়ে আর একটা কামরায়। এমন কামরায় উঠবে যে কামরায় অনেক লোক। এ কামরাটা কেমন খালি

স্থির থাকতে পারছে না দেহের উপর। সব কেমন যেন ঝাপসা। পড়ে যাবে নাকি দীপু?

কিন্তু পড়ে যায় না দীপু। শক্ত হাতে পাথরটা চেপে ধরে টাল সামলাতে চেষ্টা করে। তখনি সে দেখতে পায় সেই অদ্ভুত জীবটিকে। দীপু বুঝতে পারে মানুষের মত কোন জীব তাকে জাপটে ধরেছে। তার চোখের সামনের কুয়াশার ভিতর থেকে যেন ছুটে আসছিল দানবের মত। কি বিশ্রী দেখতে, যেন বনমানুষ। লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটে এসেছে তার কাছে।

দুর্বোধ্য ভাষায় যেন চীৎকার করে ওঠে অদ্ভুত জীবটি। মানুষের কণ্ঠে এমন বীভৎস শব্দ বের হয়না কখনো। কিন্তু মানুষের গলার স্বরের কাছাকাছি।

জ্ঞান হ'তে দীপুতো অবাক। একটা গুহার মুখের সামনে সে ঘুমিয়ে আছে। আস্তে আস্তে উঠে বসে দীপু। সারা গায়ে অসহ্য ব্যথা। হাত খানা নাড়তেও কষ্ট হয়। মাথাটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা মনে হয়। পাথর ধরে উঠে দাঁড়ায় দীপু। অবাক হয়। কোথাও কেউ নেই, চারিদিক নির্জন-নিথর—যেন প্রেতপুরী।

দীপু দেখতে পায় তার পায়ের কাছেই পড়ে আছে খানিকটা কাঁচা মাংস। কোন জন্তুর এক খানা ঠ্যাং ছিড়ে আনা। রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে আছে।

বসে বসে ভাবে দীপু। এ জায়গায় সে এসে পড়লো কেমন করে! আস্তে আস্তে সব মনে পড়ে তার। কেমন যেন মানুষের মত একটা জানোয়ার দেখেছিল সে। সে ভাবে এমনি মানুষ সে যেন আগেও কোথায় দেখেছে। কোথায় দেখেছে! মনে পড়ে দীপুর এমনি মানুষের ছবি সে দেখেছে বইতে। বইটা ছিল আদিম মানুষদের উপর। কেমন করে বনের প্রজাতির-কোন একটি জীব বিবর্তনের পথে মানুষ হয়েছে সেই ইতিহাস লেখা। "পিথেকেন্-থ্রোপাস" মানুষের একটা ছবিও ছাপা ছিল বইটায়। অমনি মানুষ যেন দেখেছিল চোখের সামনে দুর্ভেদ্য কুহেলিকার মধ্যে।

আস্তে আস্তে তার মনে পড়ে সব। লক্ষ বছর এই মানুষের দল ছিল পৃথিবীতে। তারা ছিল, না মানুষ না পশু শ্রেণীর জীব। অনুকূল পরিবেশ পেয়ে বিবর্তনের পথে মানুষ হবার দিকে যাত্রা করেছে। দেখলেই বোঝা যায় প্রকৃতি জগতে এই জীবটি মানুষ হ'তে চাইছে।

আবিষ্কার করেছিলেন এই না মানুষ না পশুর মাথার-খুলি ইউজীনডুবোয়া। ভদ্রলোক ছিলেন ডাক্তার। তিনি মনে করতেন বানর সিম্পাঞ্জী যে দেশে বেশি দেখতে পাওয়া যায় সেখানেই পাওয়া যাবে আদিম মানুষের কঙ্কাল।

তাই তিনি চাকরী নিয়ে ছুটে আসেন জাভায়। জাভায় এসে শুরু করেন ব্যাপক অনুসন্ধান। খুঁজতে খুঁজতে পেয়ে যান আদিম মানুষের নীচের চোয়াল আর দাঁত। তারপরের বছরেই পেয়ে যান উপরের চোয়াল আর দাঁত। এই হ'ল প্রথম মানুষ। তার নাম দিলেন পণ্ডিত জনেরা "পিথেকেন্‌থোপাস"।

এরাই হ'ল সেই মানুষ যারা কখনো পাথর খণ্ড কখনো গাছের ডাল অস্ত্ররূপে ব্যবহার করতে শিখেছে। গাছের ডালের মাথা সরু করে মাটি খুঁড়তো। মাটির নীচ থেকে কন্দ কখনো গাছের ফল এসব খেত। জীবটি ছিল সর্বভূক। ছোট ছোট জীবজন্তু পাথর ছুড়ে শিকার করতো। তারপর তার মাথায় আসে পাথর ঘষে অস্ত্র তৈরীর কায়দা। তখন পাথরে পাথর ঘষে তাকে ধারালো করেছে।

অবশ্যই সে আজকের মানুষের মত দেখতে নয়। শুধু সে আজকের মানুষের পূর্ব পুরুষ তা বোঝা যায় চোয়ালের গড়ন থেকে। কপাল তার পিছন দিকে ঢেলে দেওয়া। মুখটা এগিয়ে এসেছে সামনের দিকে, নাক থ্যাবরা, নাকের ডগায় দুটো বড় বড় গর্ত। কপালের খাঁজে জল জলে দুটি চোখ। ভারী মোটা ঠোঁট। গায়ে পাতলা লোম।

—চা-চা-চা--গরম চা চাই। কানের কাছে ভাঙ্গা গলার চীৎকার শুনে চমকে মাথা তোলে দীপু। ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। আর সেই

সবাইকে। তখন পণ্ডিতজনেরা ছুটবেন। গিয়ে আরো খুঁজবেন। ব্যাপক অনুসন্ধানে প্রকাশ পাবে আরো কত তথ্য! কত বই লেখা হবে সে তথ্য নিয়ে।

কিন্তু ট্রেনের কামরা থেকে আর নামা হয় না দীপুর। তার আগেই কয়েকটি পুলিশ এসে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে কামরায়। আৎকে ওঠে দীপু। ধরা পড়ে গেল বুঝি শেষটায়। নিশ্চয় বাবা পুলিশকে খবর দিয়েছেন। তাই তারা ছুটে এসেছে তাকে ধরে নিয়ে যেতে।

পুলিশ কয়টি দীপুর দিকেই এগোয়। দীপুর কান্না পায় তখন। তার আর কোন আশা নেই। সব কিছু শেষ হয়ে গেল পথেই। ছোট বলেই না তার এমন হেনেস্তা।

কিন্তু পুলিশ কয়টি দীপুকে কিছুই বলে না। এসে একেবারে দীপুর সামনে দাঁড়ায়। দীপুকে দেখে না, বরং বুড়ো লোকটির পানে কঠিন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বলে, আপনাকে নামতে হবে।

—কেন! বুড়ো মানুষটি চটে যায়। তোমরা বললেই নামতে হবে। আমি টিকিট কেটে যাচ্ছি না? এটা কি মগের মুল্লুক—আঁ।

হ্যাঁ আপনি টিকিট কেটেই যাচ্ছেন। তবুও নামতে হবে। বলতে বলতে পুলিস ইনেসপেক্টার উঠে আসেন ট্রেনের কামরায়।

পুলিশ কয়টি সসম্ভ্রমে স্যালুট ঠোকে। বুড়ো লোকটির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। কোন দিক দিয়ে দৌড়ে পালাবে তার পথ খোঁজে।

—আপনি একটু ভুল করেছেন, বলেন পুলিশ ইনেসপেক্টার। দাড়ি গোঁফ জুড়ে নিলেই ছদ্মবেশ হয় সত্য। কিন্তু তাড়াতাড়িতে লক্ষ্য করেন নি যে একটি গোঁফ আপনি বাঁকা লাগিয়েছেন।

চমকে গোঁফে হাত দেয় বুড়ো লোকটি। হাতের সঙ্গে গোঁফ জোড়া উঠে আসে। দেখে হাসি পায় দীপুর।

চারটে বাজতেই ঘুম ভেঙেছে দীপুর মায়ের। তাড়াতাড়ি উঠে

পরেছেন। সকালে বাজার থেকে বেল এসেছে। দুধ দিয়ে সরবৎ হবে এ বেলা। দীপু বেলের সরবৎ খুব ভালবাসে। দীপু ও পাড়ায় তার বন্ধুর বাড়ী গেছে খেলতে।

পরীক্ষা হয়ে গেছে। এখন অনেক দিন ছুটি। পাশ করলে কলেজে ভর্তি হবে দীপু। সারাদিন কি ঘরে বসে থাকা যায়। যাই হোক ছেলে মানুষ তো।

কিন্তু পাঁচটা বাজতেই ফিরে আসবে। দুম্‌দাম্‌ করে সিঁড়ি ভাঙবে দুষ্টু ছেলে। এসেই বলবে, কিছু খেতে দাও। ভয়ানক খিদে পেয়েছে আমার। ক্ষিদে পেলে কি বাছার আর ধৈর্য মানে। আজ আবার বেল দেখেছে। এসেই তো চেঁচাতে থাকবে, মা আমার গলা শুকিয়ে কাঠ। ঠাণ্ডা কিছু খেতে দেবে মা?

তাড়াতাড়ি সরবতের আয়োজন করেন দীপুর মা? ঝামেলাতো কম নয়। বরফ ফেলে ঠাণ্ডা করতে হবে। আবার পাইপ চাই। পাইপটা মুখে লাগিয়ে বাইরের মোড়ায় বসে বাবু সরবত খাবেন।

বিকেল গড়িয়ে যায়। সন্ধ্যা হয়। আশ্চর্য হন দীপুর মা। এমন তো করে না দীপু!

তাড়াতাড়ি এসে ঝুল বারান্দায় দাঁড়ান। রাস্তা দেখেন। দীপুর বন্ধুর বাড়ী এখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। ওরা এক সঙ্গে পড়ে। দু'জনে খুব ভাব। দীপু ফাস্ট হলে ওর বন্ধু সেকেণ্ড হবে। ওর বন্ধু ফাস্ট হ'লে দীপু সেকেণ্ড। দু'জনার ভিতর কে ফাস্ট হবে তাই নিয়ে চলে প্রতিযোগিতা। কিন্তু কেউ কাউকে ঈর্ষা করে না।

কিন্তু দীপু এখনো ফিরছে না কেন? রাস্তা দিয়ে লোক চলছে যেমন চলে তেমনি। দোকানগুলো সব হাট করে খোলা। অফিস থেকে ফিরছে সবাই। অনেকে বাজার করে ফিরছে। কেউ কেউ বেড়াতে বেরিয়েছে। হুস হাস করে গাড়ি ছুটে যাচ্ছে। কিন্তু দীপুকে এর মাঝখানে কোথাও দেখতে পান না। ভাবতে ভাবতে রান্না ঘরে যান। মন বসে না তার। বুক কাঁপতে থাকে। ছেলের

খালি। মাত্র কয়েকটি লোক তাও একজন পত্রিকার আড়ালে মুখ ঢেকে রেখেছে। তিনজনে মিষ্টি ফুর ফুরে হাওয়া পেয়ে ঘুমে কাদা। বুড়োটা তার দিকে পলকহীন চোখে তাকিয়ে আছে।

—কি খোকা চমকে উঠলে, হঠাৎ কথা বলে উঠলো বুড়ো মানুষটি।

—নাতো। দীপু সহজ ভাবে বলে। খুব গম্ভীর মুখ করে রাখে। সে বুড়ো মানুষটিকে বুঝতে দেবে না যে ভয় পেয়েছে। কিন্তু সতর্ক থাকবে। এমনি নানা কথা বলে এসব লোক ছোটদের সঙ্গে ভাব জমায়। তারপর অন্যমনস্কতার সুযোগ নেয়। দীপু তো আর কাঁচা ছেলে নয় যে সুযোগ দেবে।

—তুমি কোন ক্লাসে পড় খোকা। বুড়ো মানুষটি আবার কথা বলে। পকেট থেকে সিগারেট বের করে আগুন ধরায়।

—এবার স্কুল ফাইন্যাল দিয়েছি, দীপু গম্ভীরভাবে বলে।

—সত্যি! অবাক হন বুড়ো মানুষটি। নাকের চশমাটা একটু নিচের দিকে টেনে নামিয়ে ভাল করে দেখে। বলে, তোমার তো খুব কম বয়স খোকা।

এখন আমার ষোল চলছে, দীপু বুক ফুলিয়ে বলে। বয়সের চাইতে আমাকে ছোট দেখায়।

তাই বুঝি, বুড়ো লোকটি মজা পেয়ে যেন হাসে। বলে, তুমি খুব অল্প বয়সেই এগিয়ে গেছ। বাঃ।

আবার ষ্টেশন আসে। ট্রেন থেমে যায়। দীপু ট্রেনের কামরা পালটাবে কিনা ভাবে। ব্যাগটাকে ব্যাঙ্ক থেকে টেনে নামানো দরকার। ঐ ব্যাগের ভিতর তার অভিযানের সম্ভাব্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সংগ্রহ করে নিয়েছে। এর জন্য তাকে কম কৃচ্ছতা সাধন করতে হয়নি। টিফিন না খেয়ে টিফিনের পয়সা বাঁচিয়েছে। জন্মদিনে জামা জুতোর লোভ জয় করে টর্চ চেয়ে নিয়েছে বাবার কাছ থেকে।

দীপুর বাবা অবাক হয়েছেন দীপুর কাণ্ড দেখে। বলেছেন, টর্চ দিয়ে কি করবে দীপু। একি গ্রাম যে সন্ধ্যা হলেই অন্ধকার

হয়ে যাবে? সন্ধ্যা হলে আলোয় আলোময় হয়ে ওঠে শহর। টর্চ দিয়ে কি করবে দীপু!

মা বাবাকে থামিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, এত কৈফিয়ত দেবার বয়স হয়েছে ওর! ছেলে মানুষ চেয়েছে দিয়ে দাও। একটা টর্চ বই আর কিছু তো নয়।

দীপুর বাবা আর টু শব্দটি করেন নি। ছোট একটি টর্চ নিয়ে এসেছেন বাজার থেকে। এনে বলেছেন, বুঝলে ছোট দেখেই একটা টর্চ আনলুম। ছোট টর্চে দীপুর সুবিধাই হবে।

দীপুর বাবা জানেন না দীপু একটা ক্যামেরা বাগিয়ে নিয়েছে দাদুর কাছ থেকে। এর জন্য কতদিন দাদুর মাথার পাকা চুল বেছে তুলতে হয়েছে তাকে। একটা চুল টেনে তুলতে পারলেই দশ পয়সা পাওনা হয়েছে দীপুর। তাও কি ছাই পনেরো দিন খেটে একটা ক্যামেরা কেনার টাকা রোজগার করতে পেরেছে।

অবশ্য দাদু তাকে বিমুখ করেননি। বলেছেন, ছেলে মানুষ টাকা দিয়ে কি করবে। কি চাই বল কিনে দিচ্ছি।

দীপু ক্যামেরা চেয়েছে। হ্যাঁ, তার একটা ক্যামেরা চাই।

—হো-হো করে হেসে উঠেছেন দীপুর দাদু। ক্যামেরা চাই? দীপু তোমার রোজগারের পয়সায় ক্যামেরার খাপটাই যে শুধু পাওয়া যাবে।

দীপুর মুখ এতটুকু হয়ে গেছে তখন। কেঁদে দেয় আর কি।

তখন দাদু দীপুর গাল টিপে দিয়েছেন। বলেছেন, কাঁদবে না দীপু। তোমাকে আমি ক্যামেরাই দেবো। এখন কম দামের ক্যামেরায় হাত পাকাও। হাত পাকলে তখন ভাল ক্যামেরা পাবে।

সেই ক্যামেরাও সঙ্গে এনেছে দীপু। যদি সে আদ্দিকালের সেইসব মানুষের কোন কঙ্কাল পেয়ে যায় অথবা তাদের আঁকা অনেক ছবি। অথবা অনেক পাথুরে অস্ত্র। তবে সব কিছুর ছবি তুলে নেবে। অতগুলো প্রমাণ তো সে আর কাঁধে করে একা নিয়ে আসতে পারবে না। ছবি তুলে নিয়ে আসবে। দেখাবে তাই

দীপুর দাদু দীপুর বাবার সঙ্গে পরামর্শ করতে বসেন। দীপুর দিদাও এসে পড়েন। সিঁড়ি থেকেই কাঁদতে কাঁদতে ওঠেন। দীপুর মাকে কাঁদতে দেখে ভেঙ্গে পড়েন যেন।

দীপুর দাদু দুজনকেই ধমক দেন—তোমরা চুপ করবে? কাঁদতে বসলেই কি ছেলে ফিরে আসবে? খুঁজতে হবে না। এমনি চেঁচামেচি করলে মনস্থির করে কিছু ভাবা যায়?

কোথায় যেতে পারে দীপু? শত ভেবেও কোন কুল কিনারা করতে পারে না। সম্ভাব্য কোন জায়গার নাম করলেই ফোঁস করে ওঠেন দীপুর মা। বলেন বাঃ, ওখানে যাবে কেন দীপু। দীপু কি পাগল?

তবে মিউজিয়ামে? মিউজিয়ামেও তো যেতে পারে। আদিম মানুষদের প্রতি দীপুর ভয়ানক ঝোঁক। আদিম মানুষদের ব্যবহার করা অনেক পাথুরে অস্ত্র সাজানো আছে মিউজিয়ামে। তাও তো দেখতে যেতে পারে।

মিউজিয়াম তো বন্ধ হয়ে গেছে বেলা চারটায়, বলে ওঠেন দীপুর দাদু। এখন রাত ন'টা বাজে। সামান্য একটু পথ ট্রামে বাসে ফিরে আসতে তো কয়েক ঘণ্টা লেগে যাবার কথা নয়।

সিমুলতলায় যায় নি তো? হঠাৎ বলে ওঠেন দীপুর মা। সব সময় বাছা সিমুলতলার গল্প করতো। আমাকে কত বলেছে সিমুলতলার সেই গুহাটার কথা। বলতো, ওটা ওকে একদিন দেখতেই হবে।

—দেখ, ভাল করে দেখ ওর সব কিছু ঠিক মত আছে কিনা বলে ওঠেন দীপুর দাদু। তা হ'লেই সব বোঝা যাবে। হদিস একটা হ'তেও পারে।

আলমারী খুলতেই হদিশ পাওয়া গেল যেন খানিকটা। ওকি টর্চটাতো দেখছি না, চেঁচিয়ে ওঠেন দীপুর মা। সাইড ব্যাগটাও নেই। ক্যামেরা? ক্যামেরাটা কোথায়? হুট্ করে টেনে ড্রয়ার খোলেন। না, ক্যামেরাটাও নেই।

ক্যামেরা! অবাক হয়ে যান দীপুর বাবা। দীপুর ক্যামেরা

এল কোথা থেকে ?

দীপুর দাদু গম্ভীর হয়ে যান। বলেন, ওকে আমি একটা ক্যামেরা কিনে দিয়েছি।

—বেশ করেছেন। দীপুর বাবা যেন আর রাগ সামলাতে পারেন না। এখন বুঝুন। ও যা চাইবে তাইতো আপনারা হাতের কাছে যুগিয়ে দেন। অত আদর দিলে ছেলে মানুষের মাথা ঠিক থাকে ?

দীপুর দাদু লজ্জিতভাবে বলেন, ক্যামেরার সঙ্গে এর কি সম্পর্ক। ছেলে মানুষদের সব কিছুকেই সখ বলে ভাবা ঠিক নয়। ওদের নিজস্ব একটা জগত আছে। সে জগতে একটা ক্যামেরা থাকলে ওর সুবিধা হয়। এমনি করেই তো কৌতুহল মেটে মানুষের অভিজ্ঞতা বাড়ে।

দীপুর বাবা চুপ করে থাকেন। দীপুর মা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদেন। বলেন, ছেলেটা নিশ্চয় সিমুলতলা গিয়েছে। কেন তুমি ওকে গুহার মুখে নিয়ে গিয়েছিলে। তখন শুনেছিলে আমার কথা ?

সেটা অপরাধ হ'ল, ফোঁস করে ওঠেন দীপুর বাবা। অতো কাছে গিয়েও দেখবে না বাঘের গুহা। বাঙালী ছেলেদের গুহা দেখার সুযোগ হয় না কখনো। আর আমি গুহার মুখ থেকে ছেলেটাকে ফিরিয়ে আনবো। তখন তো তুমি অন্য কথা বলতে। বলতে না ?

তোমরা কি এখন তর্ক করবে ? আর চুপ করে থাকতে পারেন না দীপুর দাদু। ঝগড়া বন্ধ করে কি করা যায় তাই ভাব।

চলুন থানায় যাই, দীপুর বাবা বলেন।

তাই চল, বলেন দীপুর দাদু। এটা একটা ভাল পরামর্শ দিয়েছো। রেডিওতে খবর দেওয়া উচিত। কাগজেও দাও। দীপু··· দীপু শেষটায়-এই করলো। তাঁর দাদুর গলার স্বর জড়িয়ে যায়। চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসতে চায়। লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি রুমাল বের করে মুখ পোঁছেন।

খবর পেয়ে অমল আর তার বাবাও উপরে উঠে আসেন। বলেন, আমার নাম অমর বসু, অমলের বাবা।

বসুন, বসুন, সাদরে আহবান জানান দীপুর বাবা।

নানারকম অমঙ্গলের কথা মনে জাগে। ঝাপসা হয়ে ওঠে দু'চোখ।

দীপুর মা হাতের কাজ ফেলে আবার ছুটে আসেন ঝুল-বারান্দায়। ঝুঁকে রাস্তা দেখেন। রাস্তা ঠিক আগের মতই। তেমনই লোকজন চলছে। হতাশ হয়ে রান্না ঘরে ফিরে যান। কিন্তু মন মানে না তার। কেমন যেন তার বুকের ভিতর এক্কা গাড়ীর শব্দ বাজে। আবার ছুটে আসেন বারান্দায়।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামে। অন্ধকার হয়ে ওঠে ঘরগুলো। আলো জ্বালাতে ভুলে যান তিনি। বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছটফট্ করেন।

রাত হ'তে দীপুর বাবা ঘরে ফেরেন। বাড়ী অন্ধকার দেখে অবাক হয়ে যান। কোন রকমে অন্ধকার সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে আসেন। বলেন, কি গো আলো জ্বালনি যে?

—দীপু এখনো ফেরেনি, বলেন দীপুর মা। গলা থেকে যেন আওয়াজ বের হয় না তার।

—দীপু ফেরেনি? অবাক হয়ে যান দীপুর বাবা। রাত হয়ে গেল এখনো বাবু বাড়ী ফেরেন নি! তাজ্জব ব্যাপার। তার পরে বলেন, ফিরবে কেন ছেলে? তুমি আদর দিয়ে ছেলেটির মাথা খেয়েছো। অত আদর পেলে ছেলে মানুষের মাথা ঠিক থাকে!

দীপুর মা বলেন, যত দোষ সব আমার। কেন তুমি বুঝি আদর দাও না ছেলেকে!

—দি' বৈকি, দীপুর বাবা বলেন। তাই বলে তোমার মত নয়। ছেলে যা চাইবে তাই তাকে দিতে হবে। এ কি রকম কথা!

দীপুর মা কেঁদে দেন। আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছে বলেন, তুমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে বকবে না ছেলেটাকে খুঁজবে।

দীপুর বাবা তাড়াতাড়ি নেমে যান। দীপুর বন্ধুর বাড়ী যান। না সেখানে দীপু আজ যায় নি। দীপুর মামা-বাড়ীতে ফোন করেন। না সেখানেও যায় নি। প্রতিবেশীরা কেউ দীপুকে সারাদিন দেখে নি। তবে?

দীপুর মা বসে বসে কাঁদেন। হাজার রকম কথা মনে আসে। চাপা পড়েনি তো গাড়ীর তলায়? কোলকাতার রাস্তায় তো প্রতিদিন এমনি ঘটনা ঘটে। এইতো গতমাসে ঘোষালদের বাড়ীর মেয়েটার পা-টা চাপা পড়তে ডাক্তার কেটে ফেললো।

স্কুল ছুটি হতেই রাস্তায় নেমেছে মেয়েটা। পিছন থেকে একটা গাড়ী এসে হুড়মুড় করে পড়ে। ধাক্কায় ছিট্‌কে পড়ে সে অনেক দূরে। আর একটা গাড়ী এসে চাপা দিয়ে থেতলে দিয়ে যায় ডান পা খানা।

হু হু করতে থাকে মায়ের বুক। দীপুকে দুপুরে বাড়ীর বাইরে যেতে না দেওয়াই ছিল ঠিক। তা হ'লে তো এমন ঘটনা ঘটতো না। আকুল হয়ে ভগবানকে ডাকতে থাকেন তিনি।

দীপুর বাবা ফিরে আসেন কালো মুখ করে। দীপু তার বন্ধুর বাড়ী যায় নি। যায় নি তার মামা-বাড়ী। কেউ কোন খবর দিতে পারছে না। দীপু কোথাও যায় না। পাড়ার লাইব্রেরীতে মাঝে মাঝে যায়। সেখানে অনেক মূল্যবান বইয়ের সংগ্রহ আছে। দীপু সেখানে বসে বসে পড়ে। কখনো বই নিয়ে আসে বাড়ীতে। কিন্তু আজ তো লাইব্রেরী বন্ধ।

খবর পেয়ে দীপুর দাদু ছুটে আসেন। দাদুকে দেখে দীপুর মা আবার ডুকরে কেঁদে ওঠেন। কান্না শুনে প্রতিবেশীরাও ছুটে আসেন। কোন পরামর্শ হয় না। দীপুর মাকে নিয়েই সবাই ব্যস্ত। তার কান্না থামানো দরকার। তবে হয়তো বা দীপুর কোন হদিশ বের করা যেতে পারে।

কিন্তু মায়ের কান্না কি থামানো যায়। দীপুর মা কেঁদেই চলেছেন। চোখ মুছতে মুছতে বলেন, তোমরা হাসপাতালেও খবর নাও। কত ছেলে মেয়ে রাস্তায় চাপা পড়ে। কি জানি কি লেখা আছে আমার কপালে।

দীপুর বাবা হাসপাতালে হাসপাতালে টেলিফোন করেন। সেখানেও কোন খবর পাওয়া গেল না দীপুর। সবাই ভাবে ছেলেটা কি উবে গেল!

অমর বাবু বসে নিজের মনেই যেন বলেন, তাজ্জব বনেছি মশায়। দীপু পালাবে কেন। গালমন্দ করেননি তো?

মাথা নাড়েন দীপুর মা। তার একটি মাত্র ছেলে। গাল মন্দ করবেন কোন প্রাণে।

কেন এমন হ'ল, আবার মুখ খুললেন অমর বাবু। অমল তুই কিছু জানিস?

না বাবা, অমল বলে। বেচারীর মুখ শুকিয়ে গেছে সব কিছু শুনে। বলে, আমার সঙ্গে দীপুর দু'দিন দেখা নেই। আমাকে কিছুই বলেনি।

দেখ বাছা কিছু মনে করতে পার নাকি, দীপুর মা বলেন। বলতে বলতে কেঁদে ওঠেন। দীপুকে ফিরে না পেলে আমি পাগল হয়ে যাব।

না মাসিমা, বলার মত কিছু বলেনি আমাকে। অমল মাথা নীচু করে বলে। তবে বলেছিল, দীপু এমন একটা কিছু করবে যে সবাই চমকে উঠবে।

চমকে উঠবে! কেমন করে চমকে দেবে সবাইকে? দীপুর বাবা আগ্রহে ঝুঁকে পড়েন।

আর কিছু বলেনি, বলে অমল। আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম। দীপু বললো, দেখতেই পাবি।

কি করা যায়। আবার সবাই ভাবতে বসেন।

থানার সঙ্গেই যোগাযোগ করা যাক, অমর বাবু বলেন। আপনার ছেলেটি বড় ভাল। ওর যদি কিছু হয় আফশোষের শেষ থাকবে না।

থানায় যায় সবাই। দারোগা সাহেব সব শোনেন মন দিয়ে। শুনে পকেট থেকে সিগারেট বের করেন। আগুন জ্বালিয়ে এক গাল ধোঁয়া ছাড়েন। ধোঁয়া ছেড়ে বলেন, এ হ'ল এক সমস্যা। বুঝলেন, প্রতিদিন আমরা এমনি অনেক কেস পাই। জ্বালিয়ে মারলো ছোঁড়াগুলো। বুঝলেন মশাই একেবারে জ্বালিয়ে মারলো।

সবাই চুপ করে থাকে। দীপুর দাদু উসখুস করেন কিন্তু কিছু

বলেন না।

মশাই জ্বালিয়ে খেল, দারোগা সাহেব আবার মুখ খুললেন। টেবিলের ওপর হাতের ষ্টিকটা ঠুকতে ঠুকতে বললেন, কত টাকা নিয়ে গেছে ?

দীপুর বাবা গম্ভীর ভাবে বলেন, টাকা পয়সা কিছু নেয়নি।

বললেই হ'ল, দারোগা সাহেব যেন রুখে ওঠেন। দেখেছেন গিন্নীর গয়নার বাক্স। হয়তো ফাঁক করে দিয়েছে।

আপনি ভুল করছেন দারোগাবাবু, দীপুর দাদু আর চুপ করে থাকতে পারেন না।

কিছু ভুল করছি না মশায়, দারোগাসাহেব আবার বলেন। দিনরাত এই নিয়ে আছি। কত কমপ্লেইন পাই। সব ঐ একরকম। হয় বাবার টাকা নয়তো মায়ের গয়না। ব্যস, পালিয়ে গেল ছেলে। বাবা মায়ের আর কি। থানায় খবর দিয়ে চুপ চাপ। ভোগান্তি শুরু হয় আমাদের। এসব বাঁদর ধরে এনে ঘরে পৌছে দিয়ে তবে আমাদের ছুটি। মশায়, টাকা পয়সা গুলো আপনারা একটু সামলে রাখতে পারেন না। গজ গজ করতে থাকেন দারোগা বাবু।

দীপুর বাবা আর ধৈর্য রাখতে পারেন না। বিরক্ত হয়ে বলেন, আমাদের দীপু ওকরম ছেলে নয়।

সব বাপমা-ই ওরকম ভাবেন, বলেন দারোগা সাহেব। আজকালকার ছেলে ছোকড়াদের বোঝবার জো আছে ?

বিরক্ত হয়ে দীপুর দাদু মুখ খোলেন। বলেন আপনার উপদেশ শুনতে আসিনি মশায়। আমাদের ছেলে পালিয়েছে এমন কোন প্রমাণ নেই। দীপু কোথাও যায় না, পড়াশুনা নিয়েই থাকে। পরীক্ষায় ফার্ষ্ট কখনও সেকেণ্ড হয়। তাকে বিকেল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না।

ভেরিসরি, দারোগাবাবু জিব কাটেন। বলেন, চোর ডাকাতের সঙ্গে থাকতে থাকতে সবাইকে চোর ডাকাত ভাবতে শুরু করেছি। কবে হয়তো দেখবো চোর ভেবে-নিজেকেই এরেষ্ট করে বসেছি।

সামনের টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়েন দারোগা সাহেব। বলেন, বলুন আপনাদের আমরা কি সাহায্য করতে পারি।

দীপুর বাবা দীপুকে না পাওয়ার কাহিনী এক এক করে বলেন। মন দিয়ে শোনেন সব। মাথা নামিয়ে কি যেন ভাবেন। মুখ তুলে বলেন, আপনারা বসুন, আমি খোঁজ নিচ্ছি।

মিনিট পনেরো পরে ফিরে আসেন দারোগা সাহেব। এসে বলেন, পাকা খবর কিছু দিতে পারছিনে। তবে আপনাদের ছেলে কোন দুর্ঘটনায় পড়েনি এ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন।

—হাঁফ :ছেড়ে বাঁচলাম, বললেন অমরবাবু। খবরটা শোনা থেকে এক দুশ্চিন্তায় পেয়ে বসেছিল। আজকাল যা দুর্ঘটনা ঘটছে।

কিন্তু কি হ'তে পারে! দারোগা সাহেব মুখ তোলেন। দীপুর বাবাকে জিজ্ঞাসা করেন ; আপনি কিছু অনুমান করতে পারেন?

সিমুলতলা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না আমি, দীপুর বাবা বলেন। ওর কিছু আবিষ্কার করার দিকে দারুণ ঝোঁক। সিমুলতলায় একটা গুহা দেখেছিলাম। ওকে ভিতরে ঢুকতে দেইনি আমি। ওর ধারণা গুহাটার ভিতরে ছবি আঁকা আছে। ছবিগুলো নিশ্চয় আদিম মানুষের আঁকা। ওর ইচ্ছা এরকম আদিম মানুষের কোন পরিচয় আবিষ্কার করে।

খুব ইনটারেসটিং, বলেন দারোগা সাহেব। গুহার দেওয়ালে মানুষ ছবি এঁকেছে?

তাই, বলেন দীপুর বাবা। সেও প্রায় চল্লিশ হাজার বছর আগের কথা। আমিও জানতাম না এসব। দীপুই আমাকে একদিন বললো। বলল কেন সেই আদিম মানুষ দেওয়ালের গায়ে ছবি আঁকতো।

চমৎকার আপনার ছেলেটি, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলেন দারোগা সাহেব।

আজ খবর পেলাম দীপু .ওর দাদুর কাছ থেকে একটা ক্যামেরা চেয়ে নিয়েছে, দীপুর বাবা বলেন। আমার কাছ থেকে জন্মদিনের

উপহার নিয়েছে একটা টর্চ। এখন এই দু'য়ের যোগফল কিন্তু সিমুলতলার কথাই মনে করিয়ে দেয়।

তুমি ওকে টর্চ দিলে কেন ? এতক্ষণে দীপুর দাদু কথা বললেন। টর্চ দিয়ে ও কি করবে এই কলকাতায়।

এখন মনে পড়ছে সঙ্গে টর্চ ছিল না বলে আমি গুহার ভিতরটা দেখতে পাইনি। কথাটা আমি দীপুকে বলেও ছিলাম, দীপুর বাবা বলেন। বলেছিলাম টর্চ নিয়ে এসে ওকে ভিতরটা দেখাবো। এখন মনে হচ্ছে কথাটা ওর মনে গেঁথে ছিল।

আপনারা চিন্তা করবেন না, বললেন দারোগা সাহেব। দীপুর ফটো থাকলে আমাদের এক কপি পাঠিয়ে দেবেন। ফটো পেলে আমাদের অনুসন্ধানে খুব সুবিধা হয়। ফটো দিয়ে কাগজে বিজ্ঞাপনও দিতে পারেন।

আমরাও তাই ভাবছি, বললেন দীপুর বাবা।

আমরা এদিকে খোঁজ খবর নিচ্ছি, বললেন দারোগা সাহেব। পথের সব স্টেশনে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি লক্ষ্য রাখার জন্য। আপনার ছেলেটি ভাল। ফিরিয়ে দিতে পারলে খুশীই হব।

আমি কৃতজ্ঞ থাকবো, হাত জোড় করে বলেন দীপুর বাবা। ঐ আমার একটি মাত্র ছেলে। বুঝতেই পারছেন ওর মায়ের অবস্থা।

নিশ্চয় আপনার ছেলেকে আমরা পেয়ে যাব, বলেন দারোগা সাহেব। কত বাজে ছেলে খুঁজে পেতে ধরে আনি আর এমন একটি ভাল ছেলে খুঁজে আনবো না।

ছল ছল করে ওঠে দীপুর বাবার চোখ। কোন কথা বলতে পারেন না।

আমরা সব বুঝতে পারি, দারোগা সাহেব বলেন। চোর ডাকাতের সঙ্গে দিন কাটালেও আমাদের একটা সংসার আছে। আপনারা গিয়ে বিশ্রাম নিন। আমরা কোন খবর পেলে সঙ্গে সঙ্গে জানাবো। ফোন নম্বরটা রেখে যান।

এই সেই শুশুনিয়া।

নিষ্পলকে তাকিয়ে থাকে দীপু। কত দিনের স্বপ্ন আর শ্রম, আত্মবঞ্চনা রয়েছে এর পিছনে। কতদিন বসে বসে কল্পনার জাল বুনেছে। কত রকম পরিকল্পনা করেছে। স্বপ্ন দেখেছে শুশুনিয়া পাহাড়। স্বপ্ন দেখেছে সেই পাহাড়ে সে একা একা চলছে।

স্বপ্ন ভেঙেছে এক সময়। উঠে বসেছে বিছানায়। কোথায় শুশুনিয়া। দীপু বসে আছে তাদের বাড়ীতে তার নিজের বিছানায়। টিক্ টিক্ করে চলছে টেবিল ঘড়ি। ঘরে ম্লান নীলাভ আলো। চোখ খুললেই বই-এর সেলফ্। দেওয়ালে রবীন্দ্রনাথের ছবি।

কত দুপুর এই ঘরে বসে কাটিয়েছে দীপু। বইএর পর বই পড়েছে। জানতে চেয়েছে কোথা থেকে এল মানুষ। কেমন করে হ'ল তারা আজকের মানুষ। এ খবর জানতে শুধু দীপু নয় হাজার হাজার মানুষ খেটেছে। এখনো খাটছে। এ হ'ল তপস্যার মত। নিজের সুখ দুঃখ ভুলে অনুসন্ধান করতে হয়েছে। তবেই না অজ্ঞাত অতীতের রূপ রেখা আঁকা সম্ভব হয়েছে।

দূরে দেখা যায় শুশুনিয়া। দেখে মনে হয় যেন বিরাট একটা হাতী ওপারেরর জগৎকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে।

দীপু পাথরের মত দাঁড়িয়ে থাকে। চলতে ভুলে যায়। শুধু দেখে, দেখে নিষ্পলক দৃষ্টিতে।

তু' কুথা যাবি বটে? বৃদ্ধ চাষী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

দীপু কোন জবাব দেয় না। মুখের ভাষা যেন তার হারিয়ে গেছে। পা বাড়ায়। দ্রুত চলে। পারে তো ছুটে যায়। পিছনের সাঁওতাল চাষী অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

দিন প্রায় শেষ হ'তে চলেছে। সূর্য এবার ঢলে পড়বে পশ্চিম আকাশে। শুশুনিয়ার মাথায় ছড়িয়ে দেবে মুঠো মুঠো আবীর। লক্ষ লক্ষ বছর আগেও এমনি আবির ছড়িয়ে দিয়ে বিদায় নিত সূর্য। সে যুগের মানুষও কি তখন অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখতো

রংয়ের এই কুহকী মায়া ?

একটা গরুর গাড়ী আসছে। উঁচু নীচু পথ। খ্যাচ্ খ্যাচ্ করে আওয়াজ উঠছে চাকায়। গরুর গলায় ঘণ্টা দুলে দুলে শব্দ হয়। ঠং ঠং ঠং। যেন অন্য কোন দেশ থেকে ভেসে আসছে শব্দ। গাড়ীর ভিতর একটি বৌ বসে। সে যেন এদেশের নয়। গাড়োয়ান বোধহয় তার স্বামী। যুগ যুগান্ত ধরে এমনি গাড়ী চলছে। বৌটি ভিতরে বসে থাকে। এমনি করে সহরের বাবু অবাক বিস্ময়ে দেখে।

ভয়ানক তৃষ্ণা পেয়েছে দীপুর। চারিদিকে তাকায়। দূরে দূরে আতা গাছ। রুক্ষ লাল মাটি। কাঁকড় যেন দাঁত বের করে হাঁসছে। রাস্তার পাশে খাদ, তার উপর বুনোলতা আর ঘাস। এখানে ওখানে নগ্ন তাল গাছ।

দীপু নিজের বুদ্ধির তারিফ করে। ক্রেপসের জুতো পরে এসে ঠিক কাজ করেছে। সু'পড়ে এলে তাকে আর হাঁটতে হ'তনা এই কাঁকর বিছান রাস্তায়।

ঘটাং ঘটাং। দীপু কান খাড়া করে শোনে জল তোলার শব্দ। দীপু এগিয়ে যায়। যা ভেবেছে ঠিক তাই। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা একখানা বাড়ী। ভিতরে শাক সব্জীর খেত। ছোট একখানা ঘর। একটা লোক জল তুলছে কুয়ো থেকে। বালতী ভরে সে জল এনে ঢেলে দিচ্ছে ক্ষেতে। দীপু এগিয়ে যায়।

একটু জল দেবেন, জল খাব। দীপু বলে।

তাড়াতাড়ি করে লোকটি জল এনে দেয় দীপুকে। দীপু মুহূর্তে গ্লাসটা নিঃশেষ করে ফেলে। যা তৃষ্ণা পেয়েছিল তার।

চ্যাটার্জ্জী বাড়ীর ছেলেতো ? লোকটি দীপুকে জিজ্ঞাসা করে। কপালের উপর ভুরু দুটি বাঁকা হয়ে যায়। একলহমা দেখে নিয়ে বলে, চ্যাটার্জ্জী বাবু তোমার কে হন ?

মামা, দীপু ফস করে বলে। এমন ঝট্ করে বলে দেয়, মনে হয় যেন দীপু আগে থেকেই জবাব ঠিক করে রেখেছে। সে তার নিজের বুদ্ধির তারিফ করে মনে মনে। দীপু জানে এই গ্রামের

সরল মানুষটি সত্য কথা জানতে পারলেই বিপদজনক হয়ে উঠবে। খপ করে হাতখানা চেপে ধরবে। চোখ পাকিয়ে বলবে, এতটুকু ছেলে বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছো? চল থানায়। এতক্ষণে কি দীপুর বাবা আর থানায় খবর দেননি।

সুতরাং আর কোন কথা নয়, চল কোলকাতা। কেন পালিয়েছ, কেন এত দূর এসেছ এসবের খোঁজ নেওয়ার কোন দরকার নেই। তুমি ছোট, ছোটর মত থাক।

দীপুর সব সহ্য হয়, কিন্তু 'তুমি ছোট' এ কথাটা কিছুতেই সহ্য হয় না। সে আর ছোট কোথায়? আর দু'মাস বাদেই তার স্কুল জীবন শেষ হবে। দীপু কলেজে যাবে। খুব কি ছোট সে!

তুমি চ্যাটার্জ্জী বাবুর ভাগনে, লোকটি আবার কথা বলে। আমি দেখেই বুঝতে পেরেছি। তোমরা কোলকাতায় থাক। তাই না?

দীপু তাড়াতাড়ি ঘাড় কাত করে। কথা বাড়াতে চায় না। কি জানি কখন বেফাঁস কিছু বলে বসবে। তাড়াতাড়ি জলের বোতলটা এগিয়ে দেয়। এক বোতল জল নেয়। তার ব্যাগে রুটি আছে। ষ্টেশন থেকে কিনে নিয়েছে। সঙ্গে আছে এক টিন বিস্কুট। গুড়ো দুধের টিনও নিয়েছে একটা। ছোট ছুরি, সসপেন, মগ এসব রাখতে হয় বাইরে কোথাও গেলে। যারা দুর্গমের অন্ধকার পথে পা দেয় তারা সব কিছু সঙ্গে করে নিয়ে যায়। জনমানবহীন পাহাড়, দুর্ভেদ্য অরণ্য এসব জায়গায়তো আর কিছু পাবার উপায় নেই।

দীপু বাগান থেকে বেড়িয়ে আসে। দূরে শুশুনিয়ার পাহাড় দেখা যায়। পড়ন্ত রোদ তার চূড়ায় চূড়ায়। রক্তের মত লাল আকাশ। রক্তের নিস্তরঙ্গ সমুদ্র যেন—একেই বলে বোধহয় রক্ত-সন্ধ্যা।

একদিন এই শুশুনিয়া ছিল নানা জীব জন্তুর আবাস ভূমি। দিনের পর দিন চলেছে তাদের জীবন মৃত্যুর লীলা। গভীর অরণ্যে তারা দিন কাটিয়েছে বেঁচে থাকার কামনায়। আক্রান্ত হয়েছে, কখনো আক্রমণ করেছে দুর্বলকে। এমনি খাদ্য খাদক সম্পর্ক নিয়ে পৃথিবীর জীবজগতের আজব সংসার। এক নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা

কে কাকে হত্যা করে সংগ্রহ করবে নিজের বাঁচার রসদ। এই নিষ্ঠুর উলঙ্গ জীবন সংগ্রামে মানুষ ছিল অসহায় জীব। তাই দলে দলে তারা হারিয়ে গেছে, কেড়ে নিয়েছে তাদের মৃত্যুর নির্দয় হাত। তবু তারাই শেষ পর্যন্ত জিতে গেল। কারণ তার বুদ্ধি আর অপার জিজ্ঞাসা। এ দুটো ছিল বলেই মানুষ হারিয়ে যায় নি। নয় তো মৃত্যুর যজ্ঞে তার আহুতি ঘটা উচিত ছিল সবার আগে। নিত্যকালের শুশুনিয়ার এই জীবন সংগ্রামের শিয়রে সূর্যাস্তের ঐ রক্তাভ আকাশ বড় স্বাভাবিক মনে হয় দীপুর।

দীপু তাড়াতাড়ি করে হাঁটে। রাস্তায় ক্রমশই কাঁকড় বালি বেড়ে যায়। এখানে ওখানে পাথরের চাঁই। তার মাঝখান থেকে পায়ে চলার পথ। চড়াই উৎরাইয়ের পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে শুশুনিয়ার দিকে।

চড়াই উৎরাই ভাঙ্গতে ভালই লাগে দীপুর। মনে হয় কখনো উপরে উঠছে—উঠে যাবে ঐ আকাশে। আবার যখন উৎরাইতে নামে, মনে হয় নেমে যেতে হবে পৃথিবীর জঠরে। যেখানে আজো সংখ্যাহীন ধাতব পদার্থ উত্তাপে গলে থকথকে সমুদ্র হয়ে আছে।

এখানে ওখানে বড় বড় পাথরের চাঁই। বুক ফেটে হা হয়ে আছে। পাথরের পর পাথর সাজানো। দেখে বোঝা যায় এই সব খাদ বেয়ে বর্ষাকালে জল নামে। তখন বোধহয় ঝর্ণার মত দেখতে হয়।

কিচির মিচির করে শালিক পাখী ডাকে। খেজুর গাছের শুকনো পাতায় ফিঙ্গে বসে লেজ নাচায়। দশ এগারোটা গরু নামছে উৎরাইয়ের পথ বেয়ে। তাদের পিছনে দীপুর বয়সী একটি ছেলে। মাথায় গামছা দিয়ে পাগড়ী বাঁধা। হাতে লাঠি। লাঠির মাথায় লাল কাপড় বাঁধা। হেই হেই করে গরুগুলোকে তাড়া দিচ্ছে।

দীপুকে দেখে ছেলেটি দাঁড়িয়ে পড়ে। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। কোমরে একফালি কাপড় বাঁধা—ঠিক যেন নন্দলাল বসুর আঁকা ছবি। দীপুও কম অবাক হয় না।

পাহাড় আর কতদূর? দীপু জিজ্ঞাসা করে।

হেই যে তালগাছ, ছেলেটি আঙ্গুল তুলে দেখায়। বলে হোথা যাবি ? কিন্তু জবাব শোনার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না ছেলেটি। একটা গরু উৎরাই বেয়ে নীচের জমির দিকে দ্রুত নেমে যায়। তাকে ফেরাতে ছুটে যায় ছেলেটি। গরুটা ছড়ি খেয়ে চলে আসে গরুর ভিড়ে। আবার চলতে থাকে। ঘাড় ঘুরিয়ে দীপুকে দেখে ছেলেটি। ছেলেটির বিস্ময়ের আর শেষ নেই।

পাহাড়ের গা ঘেষে পায়ে চলার পথ। এক পাশে পাথরের ঢিপি। লাল রং। যেন সুরকীর তাল জমিয়ে রেখেছে কেউ। জল গা বেয়ে নামে তাই ভয়ানক এবড়ো খেবড়ো। যেন কেউ আনাড়ি হাতে কর্ণিক দিয়ে আঁচড়ে দিয়েছে। ছোট ছোট ঘাসের চাপড়া। ছোট ছোট গাছ। ডাল পালা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। একটা বাজ পাখী বসে আছে দূরে একটা পাথরের উপর। হয়তো ইঁদুর দেখতে পেয়ে ওত পেতে বসে আছে।

চলতে চলতে একটা নদীর সামনে এসে পড়ে দীপু। নদীর মাঝখানে সুতোর মত জলের রেখা। বালিতে খাদ ভরাট। শুকনো চেহারা দেখে বোঝা যায় বর্ষাকালে এটা নদী হয়। তখন সে খরস্রোতা। হুড় মুড় করে ঘোলা জল ছোটে।

পাহাড়ের গা বেয়ে জল নামে। সেই জল এই নদী বেয়ে তীর বেগে ছুটতে থাকে। ছুটে নেমে যায় নিচের দিকে। সঙ্গে করে নিয়ে যায় নুড়ির পাহাড়।

নদীতে নামে দীপু। নদীর জল রক্তের মত লাল। জায়গাটা বড় নির্জন। নিঃসঙ্গ গাছ। নদীর মধ্যে মরা কচ্ছপের খোলের মত পাথরের চাই। দীপু পাথরটার উপর বসে পরে।

নদীর একদিকে খাড়াই। বড় বড় পাথর দাঁড় করিয়ে যেন দেওয়াল তৈরী। তার ফাঁকে ফাঁকে নাম না জানা লতার জটলা। দীপুর মনে পরে যায় খারারার কথা। চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে। না খারারার মত কোন গুহা চোখে পরে না। শুধু চোখে পরে কালো পাথর কেমন রাঙ্গা হয়ে আছে। কে এমন সিঁদুর লিপে

রেখেছে ?

দীপুর মনে হয় পাথর গুলো কথা বলছে। কিন্তু তাদের ভাষা যে এক আলাদা ভাষা। সে ভাষা আর কেউ জানেনা। এমনি সারা দিন পিঠ পেতে রেখে তারা রোদ পোষায়। সন্ধ্যা হ'লে সিঁদুরের রংয়ে প্রসাধন করে গল্প করতে বসে। আমরা সে ভাষা বুঝিনে।

বুঝতে পারিনে বলেই পাথর অটল, অনড়, নির্বাক, মৃত বলে মনে হয়। হোক মৃত, তবুও তাদেও ইতিহাস আছে, আছে একটা জন্মের কাহিনী। তারপর শুরু হ'ল বিবর্তনের জীবন। চিরকাল এই পাথর এমনি ছিল না। পৃথিবীর যখন জন্ম হয় তখন এই পাথর ছিল গলিত লাভা। তার পরে দিনের পর দিন সে জমতে থাকে, জমতে জমতে নিষ্ঠুরের মত কঠোর হয়ে যায়।

এ পাথর গুলো হ'ল মৃত অতীতের মূক সাক্ষী। সামান্য এক কোষী জীব থেকে কত বিবর্তনের পথে কত পরিবর্তন তার। এমনি করে পরিবর্তনের পথে পৃথিবীর বৈচিত্র্যময় জীব ও জগৎ। পণ্ডিতরা বলেন, বার বার আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটেছে পৃথিবীতে। বানর প্রজাতীর কোন এক শাখা আবহাওয়া পরিবর্তনের ফলে গাছ ছেড়ে মাটিতে নেমেছে। চেষ্টা করে হাঁটতে শিখেছে। এমনি করে সে তার অভ্যাস পাল্টিয়েছে প্রয়োজনের তাগিদে। অভ্যাস পাল্টাতে গিয়ে চেহারা পাল্টিয়েছে। চেহারা পাল্টিয়ে মানুষ হয়েছে।

দীপু চমকে ওঠে। সূর্য কখন নিভে গেছে। চারিদিক অন্ধকার। দ্রুত সে অন্ধকার ঘন হচ্ছে। সে একা বসে আছে। পাথর গুলোকে তখন তার মৃত দেহের স্তূপ বলে মনে হয়। ফিস্ ফিস্ করে হাওয়া যেন কথা বলছে কানের পাশে। কোথায় যেন ঝিঁঝিঁ ডাকছে। কেঁপে কেঁপে ওঠে দীপু। তার কি রকম ভয় করছে।

ঝিঁঝিঁর ডাক থেমে যায়। চারিদিক নির্জন। সেই নির্জনতা যেন দীপুর বুকের ওপর চেপে বসে। অন্ধকারকে কানা ডাইনীর চুলের জটের মত মনে হয়। নদী যেন ডাইনীর শুকনো হাতের শিরার দাগ। তির তির করে রক্ত বইছে। এই ডাইনীই একদিন

পাথরগুলোকে তার তীক্ষ্ণ নখ নিয়ে আঁচড়ে ছিঁড়ে দিয়েছে। ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে দীপুর মাথা।

দূর থেকে একটা আলো আসছে। দীপু তাকিয়ে থাকে। আলো যেন তার দিকেই এগিয়ে আসছে। দীপু চুপ করে বসে থাকে। সে লোক গুলোর সঙ্গ নেবে। কোন গাঁয়ে চলে যাবে। রাত্রির মত একটা নিরাপদ আশ্রয় চাই। কাল ভোর হ'লে ভাবা যাবে আগামী কর্মসূচী।

দীপুর বাবা মা কি করছেন? দীপু বাড়ীর কথা ভাববার চেষ্টা করে। নিশ্চয় খোঁজাখুঁজি করছে সবাই। হয়তো তার বাবা থানায় গিয়েছেন। সে হারিয়ে গিয়েছে বলে হয়তো রেডিওতে ঘোষণা বেড়িয়ে গেছে এতক্ষণে। তার চেহারার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কালকের কাগজে তার ছবি সমেত বিজ্ঞাপনও থাকতে পারে।

দীপু দেখতে পেল হ্যারিকেন হাতে নিয়ে তিনটি পুলিশ তার দিকেই এগিয়ে আসছে। মাথায় পাগড়ী। হাতে লম্বা লাঠি। দীপুর দিকেই কাকড়ে মোটা জুতোর আওয়াজ তুলে এগিয়ে আসছে।

বাবা খবর দিয়েছেন পুলিশকে। এর ভিতর টের পেয়েছে যে দীপু এখানে। তবে কি তার বাবা ডাইরি খুঁজে পেয়েছেন। যাতে করে কেউ কিছু আঁচ করতে পারে তাই বলেনি অভিযানের কথা। কাউকে সঙ্গী করে নেবার লোভ সংবরণ করতে হয়েছে তাকে। তবে কালকে রাত্রে সে ডাইরীতে লিখে রেখেছে আজকের কথা।

লিখেছে—আগামীকাল যাত্রা করবো শুশুনিয়ার উদ্দেশ্যে। এই শুশুনিয়ায় আদিম কালে মানুষ বাস করতো। তারা পাথর কুড়িয়ে এনে ঘষে ঘষে অস্ত্র তৈরী করতো। সেই পাথুরে অস্ত্র দিয়ে শিকার করতো। এ হ'ল মানব সভ্যতার সূচনার প্রথম দিক। পশু থেকে মানুষ হবার প্রথম ধাপ। অসহায় জীবন ছেড়ে স্বাবলম্বী হবার প্রথম স্তর।

ভারতবর্ষের মোহেন-জো-দড়ো হ'ল প্রাগৈতিহাসিক সময়ের তাম্র প্রস্তর যুগের সভ্যতা। তার আগেই ছিল নব-প্রস্তর যুগ। ধাপে

ধাপে তার একটা আরম্ভ আছে। তার আরম্ভ মধ্য-প্রস্তর যুগ থেকে। তার আদিতে আছে আদি-প্রস্তর যুগ। সেখান থেকেই মানুষের যাত্রা।

ভারতবর্ষের এখানে ওখানে সামান্য পাথুরে অস্ত্র পাওয়া গেছে। সেটাই শেষ কথা নয়। এখানে মনুষ্য জন্মের বিকাশ হয়েছিল, এবং ছিল তাদের রোমাঞ্চকর জীবন-সংগ্রাম। আমার বিশ্বাস শুশুনিয়া পাহাড়ে অনুসন্ধান চালালে সেই মানুষগুলিকে আমরা খুঁজে পাব। কেউ মনযোগ দেয়নি। আমি একা এগিয়ে যাব। আবিষ্কার করে আনবো তার প্রমাণ।

ডাইরী খানা দীপু তার বইয়ের ভিতর লুকিয়ে রেখে এসেছে। তবে কি দীপুর বাবা খুঁজে পেয়েছেন ডাইরী। আর সেই ডাইরী তুলে দিয়েছেন পুলিশের হাতে। পুলিশ খবর পেয়ে ছুটে এসেছে। পথে নিশ্চয় দেখা হয়েছে সেই গাড়োয়ানের সঙ্গে। তাকেই তো দীপু পথের নিশানা জিজ্ঞাসা করেছিল।

পুলিশকে সেই লোকটিই তার হদিস দিয়েছে। গ্রামের আরো অনেক লোক তাকে এদিকে আসতে দেখেছে। সেই বাগানের মালী। ভেবেছিল চ্যাটার্জীদের ভাগ্নে। সেও পুলিশকে সাহায্য করতে পারে। তারপর সেই রাখাল বালকটি। সবাই তার পানে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল। তখনি সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

এখন পুলিশ এসে ধরে নিয়ে যাবে। শেষ হয়ে যাবে তার আশা আকাঙ্খা। দীপুকে ওরা কোলকাতা নিয়ে যাবে। শুশুনিয়ার অতীত যুগের মানুষ আবার তমিশ্রায় মুখ ডোবাবে।

দীপু তাড়াতাড়ি পাথরটার আড়ালে গিয়ে বসে পড়ে। পুলিশ তিনটি এসে পড়ে একেবারে পাথরের কাছে। তাদের গলা স্পষ্ট শুনতে পায় দীপু। চোখে পড়ে আলো।

একজন বলে, লেড়কালোক বহুত বদমাইস হো গিয়া।

সঙ্গে সঙ্গে আর একজন পুলিশ বলে, সচ্ বাত।

আর একটি পুলিশ গজ গজ করে, ভাগ গিয়া। হামলোককা

ক্যা কসুর। ডিউটি কা বাত হায় ডিউটি দেওগে। লেকিন দুস্‌রা বাতকা হামারা কেয়া ?

—জি, জি, অন্যজন সমর্থন করে।

দীপু পাথরের ফাটলে সিটিয়ে যায়। তার কথাইতো ওরা আলোচনা করছে। যদি ধরা পড়ে যায়।

পুলিশগুলো কিন্তু দাঁড়ায় না, এগিয়ে যায়। পাথরটার কাছে এসেই ডান দিকে বাঁক নেয়। তারপর চলতে থাকে।

দীপু পাথরের আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে দেখে। পুলিশ তিনটি অনেক দূরে এগিয়ে গেছে। ঝট্ করে সে উঠে দাঁড়ায়। এই তার সুযোগ। তাকে পালাতে হবে। অনেক দূরে পালাতে হবে। সারা রাত খুঁজে পুলিশ যাতে বার না করতে পারে তার হদিস।

দীপু নদীর বালির উপর দিয়ে দৌড় দেয়। দৌড় আর দৌড়। উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়তে থাকে দীপু। বালিতে পা বসে যায়। পাথরের ওপর পা পড়ে পা পিছ্‌লে যায়। কোন লক্ষ্য নেই দীপুর। ফ্লাকসটা ঘা লেগে ফেটে চৌচির হয়ে যায়। তবুও থামেনা দীপু। হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল কয়েকবার। সারা গায়ে বালি। বালিগুলো ঝেড়ে ফেলার কথাও মনে আসে না তার। কারা যেন পিছন থেকে তাড়া করে তাকে। আর প্রাণ ভয়ে ছুটে পালাচ্ছে সে। কোথায় পালাবে তা সে জানেনা। কোথায় পালাচ্ছে তাও জানে না। শুধু ছুট্‌ছে। ছুট্‌তে ছুট্‌তে হাঁপিয়ে পড়ে দীপু। পা অবশ হয়ে আসে। বুক হাঁপরের মত ওঠা নামা করে। নাকের পাটা ফুলে যায়। ঘামে জামা ভিজে যায়।

আর পারে না দীপু। অবসন্ন হয়ে আসে শরীর। দাঁড়িয়ে থাকতেও পারে না। চিত্ হয়ে শুয়ে পড়েছে পাথরের উপর। মাথার কাছে ব্যাগ। আকাশে মুক্তো বিন্দুর মত তারার মালা। আরো দূরে দুধের নদীর মত নীহারিকা পুঞ্জ—এরি নাম বোধহয় আকাশ গঙ্গা।

কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ে দীপু। ঠাণ্ডা হাওয়া এসে লুটিয়ে পড়ে

গায়। একটু দূরেই একটা মহুয়া গাছ। পাতার ফাঁকে অন্ধকার জমে জমে বড় নিবিড়। জোনাকি পোকা থেকে থেকে আলো জ্বালে। একটা গিরগিটি হাঁটতে হাঁটতে চলে আসে একেবারে দীপুর কাছে। মাথা তুলে দীপুকে দেখে কি দেখে সেই-ই জানে। দীপু কিছুই জানেনা। সে তখন গভীর ঘুমের দেশে ভেসে চলছে, জলের বুকে ভেসে চলা হালকা সোলার মত।

সূর্য ওঠে। রোদ এসে পড়ে পাথরের বুকে। আস্তে আস্তে তেতে ওঠে পাথর। ঘুম ভাঙ্গে দীপুর। চোখ খুলে দীপু তো অবাক। মহুয়া গাছ তখন নিথর। চারিদিক নিস্তব্ধতায় আদিম প্রকৃতি যেন তখনো ঘুমন্ত। দূরে পাহাড়ের শ্রেণী। কালো পাথরের চাঁই। বুনোলতা খাদের দিকে নেমে গেছে। বুনো গাছের পাতা ছাতির মত মেলে রেখেছে আকাশের দিকে। রোদ পড়েছে। তার নিচেই ছায়া। বড় অপরূপ মনে হয় সব।

দীপু উঠে দাঁড়ায়। সারা গা ব্যথা। আড়মোড়া ভাঙ্গে। শরীর টান্ টান্ করে। চোখ পড়ে দূরে। নীল আকাশ—যেন নীল রংয়ের গামলা। তার নীচে পাহাড়ের চূড়ো। রুক্ষ, নিষ্ঠুর, ত্রিশুলের মত উদ্ধত। রোদ পেয়ে ধাতব উজ্জ্বলতায় যেন জ্বলছে।

খিদে পেয়েছে। ব্যাগ খুলে রুটি বের করে। মাখন মেখে নেয়।

ছেলেটিকে প্রথম দীপুই দেখতে পায়। পাথর টপকে টপকে তার দিকেই এগিয়ে আসছে। কোমরে কষি বাঁধা। হাতে তীর ধনুক। নিকশ কালো গায়ের রং। মাথায় একরাশ ঝাক্‌রা চুল।

দীপুর কাছে এগিয়ে আসে। এখানে দীপুকে দেখে সে কম অবাক হয়নি। কাছে এসে বলে—তু কে বটে?

আমি দীপু, দীপু জবাব দেয়। কোলকাতা থেকে এসেছি।

—কোলকাতা! ছেলেটি বিস্ময় মাখানো কণ্ঠে বলে। কুথা যাবিক তুই?

বাঃ! দীপু প্রশংসা না করে পারে না। তুই তো বেশ বাংলা বলিস।

—সেতো বলবেই, ছেলেটি বলে। আমিতো দু'শাল কোলকাতাকে ছিলাম বটে।

তাই নাকি! কোথায় ছিলি? দীপুর কৌতূহল বেড়ে যায়।

হো বাটের নামটো মালুম নাই, ছেলেটি বলে! মা বাবুর বাড়ী কাজ কইরতো। সে মা-টা হো বাটে মইরে গেল। ফিরা এলাম বটে।

তোর নাম কি? দীপু জিজ্ঞাসা করে।

—কান্না আমায় বলবিক। আঙ্গুল তুলে দূরে দেখায়। হো বাটে গাঁয়ে থাকি।

তোর কে কে আছে রে? দীপু আবার জিজ্ঞাসা করে।

কেউ নাই। নরম কলায় কান্না জবাব দেয়। মা-টা ছিল সেটা ভি মইরে গেল।

ছেলেটির প্রতি মমতা জাগে দীপুর। বলে, বোস এখানে। রুটি খাবি। মাখন মেখে তৈরী করেছি। খুব ভাল লাগে খেতে।

কান্না মাথা নামিয়ে সম্মতি জানায়। বলে—খাবেক নাই ক্যান্নেরে। সে রাতকে কিছুক খাইলা না বটে।

রুটি খায় দু'জনে। দীপু বলে এদিকে কোথায় যাচ্ছিস?

শুশুনিয়া পাহাড়ের গুহায়, কান্না বলে।

কেন রে? দীপু জানতে চায়।

সি গুহায় শেয়াল আছে বটে, কান্না বলে। সিটো মাইরব। হামার হাঁসটো লিয়ে লিয়েছে।

চল আমিও যাব, দীপু বলে।

দু'জনে চলতে থাকে। কান্না আর দীপু। একজন কোলকাতা শহরে মানুষ। অন্যজন গ্রামের মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কখনো গাছে উঠে, কখনো নদীতে নেমে, মোষ চড়িয়ে মানুষ। তবুও দু'জনে সহজেই কাছাকাছি এসে পড়ে। পাথরের পর পাথর টপকায়। কখনো উঁচুতে ওঠে কখনো নীচুতে নামে। কখনো জঙ্গলে ঢোকে।

দীপু বলে, আমাকে সব ঘুরিয়ে দেখাতে পারবি?

পারবেক নাই ক্যান্নেরে! কান্না বলে। কি দিবি। এটা দিবি?

কান্না দীপুর কাঁধের ভাঙ্গা ফ্লাবসটা দেখায়।

এটা দিয়ে কি করবি—দীপু বলে। এটা ভেঙ্গে গেছে। তুই এটাই চাইলি!

দু'জনে এগোতে থাকে। তুলসী বন। মানুষ প্রমাণ সব উঁচু গাছ। তার মাঝখান থেকে পায়ে চলার পথ। হলুদ রঙের প্রজাপতি ডানা নেড়ে ঘুরছে। হাওয়ায় তুলসী পাতার গন্ধ। গন্ধ যেন ফুলের পরাগের মত ভাসছে। এমনি গন্ধ আর কোনদিন কোথাও পায়নি। গন্ধটি বড় কড়া—যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। কিন্তু দম বন্ধ হয় না। ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকে চেতনা। ইচ্ছে হয় তুলসী বনের উপর লুটিয়ে পড়তে। গন্ধ নিতে নিতে ঘুমিয়ে পড়তে।

বাঁকটা ঘুরে একটা সমতল জায়গায় নেমে পড়ে দু'জনে। সবুজ ঘাসের চাপড়া। দূর থেকে মনে হয় যেন সবুজ ঘাসের গালিচা। মাঝে মাঝে রূপালী নকশার মত বালি। দু'একটা ছোট ছোট আতা গাছ। পাথরের মাথা মুখ তুলে আছে গালিচা ভেদ করে। বালির রেখা যেন এঁকে বেঁকে পাথরগুলোর পাশ দিয়ে চলে গেছে।

—ঝর্ণা যাবিক?

—চল, দীপু বলে। জল পড়ে?

—না। হেই বর্ষায় জল নামবেক বটে, কান্না বলে।

দু'পাশে দুটো পাহাড়। মাঝখানে সমতল ভূমি। দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে এগোয়। গিয়ে পৌঁছে যায় ঝর্ণার কাছে।

কোথায় ঝর্ণা! পাহাড়ের বুক চিরে খাদ কাটা। বর্ষাকালে এখান থেকে উপরের জল নামে। এখন প্রায় শুকনো। পাথরের ফোকরে কোথাও জল, কোথাও শেওলা মরে শুকিয়ে আছে।

—চল, কোথা থেকে এটা নেমেছে দেখবো। কি যাবি? দীপু জিজ্ঞাসা করে।

—হেই হোথায়। কান্না পাহাড়ের মাথা দেখিয়ে দেয়।

ওরা ঝর্ণার খাদ ধরে চলে।

দু'পাশে গাছের সারি। ঝুঁকে পড়েছে ঝর্ণার উপর। দেখে মনে

হয় যেন একটা সরীসৃপ অনন্তকাল ধরে শুয়ে আছে গাছের ছায়ায়।

চাপা নরম আলো। এখানে ওখানে তির্যক রেখায় রোদের ফালি। চারদিক অস্বাভাবিক নির্জন। একটা পাখীও চোখে পড়ে না।

খানিকটা এগোতেই লাল পাথরের চাঁই, বুকটা কে যেন ধারালো নখ দিয়ে চিরে ফেলেছে। সেই রক্তে লাল হয়ে আছে পাথর। নিচেই খাদ! সেখানে জল জমে আছে। টল টল করছে সে জল। কয়েকটা ছোট মাছ লেজ নেড়ে নেড়ে খেলছে। পাথরে খাঁজে একটা কাঁকড়া বসে আছে।

ওদের পায়ের শব্দ শুনে জলে নেমে যায় কাঁকড়া। দীপু হেসে ওঠে। অমনি শুকনো পাতায় সরসর শব্দ তুলে কি যেন সরে যায় দূরে। দীপু চমকে ওঠে। দেখতে পায় একটা সাপ চলেছে এঁকে বেঁকে।

আর জল নেই। খটখটে শুকনো ঝরনা। উঁচু নিচু কোয়ার্ট-জাইট পাথর। পা ফসকে যেতে চায়। ওরা সাবধানে চলে। খাদ ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হ'তে থাকে। গাছপালায় নিবিড়। আলো কম। চলার আনন্দে দু'জনে চলছে। চলতে চলতে উঠে আসে। পাহাড়ের মাথায়। এখান থেকেই জল নেমে গেছে নিচের দিকে। তারপর আবার উপরে উঠে গেছে পাহাড়ের আর একটা চূড়া। সবুজ গাছপালায় ঢাকা। মনে হয় যেন ধাপে ধাপে কে সবুজ গালিচা পেতে রেখেছে! কে জানে এই পথেই বোধহয় সূর্য ওঠে। ঐ তো দূরে পাহাড়ের চূড়া। ওখানে উঠে দাঁড়িয়ে থাকে সূর্য। সাত-ঘোড়ার রথ এসে তাকে তুলে নিয়ে যায় আকাশে।

পায়ের কাছ থেকেই আর একটা খাদ নেমেছে। এটা হ'ল পাহাড়ের মাথার জল উল্টো দিকে নামার পথ।

দীপু বলে, চল, কান্না এ দিক দিয়ে নিচে নামি!

কান্নার চোখ চক্ চক্ করে আনন্দে। তা'র খুব ভাল লাগছে দীপুকে। কি সুন্দর ছেলেটি দেখতে। দামী সার্ট প্যাণ্ট পরে আছে। নাকের নিচটা কালো হয়ে উঠেছে। কান্নার চোখে চোখ পড়লেই এক ঝলক হাসি খেলে যায় মুখে।

দু'জনে খাদ বেয়ে নামতে থাকে। ছোট ছোট নুড়িতে খাদ ঠাসা দু' একটা নুড়ি হাতে তুলে নেয় দীপু। না মোটেই মিলছে না। সে তো মিউজিয়ামে গিয়ে কম পাথুরে অস্ত্র দেখেনি। বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেছে তাদের বৈশিষ্ট্য। বইতেও দেখেছে অনেক ছবি। সেগুলোর সঙ্গে মিল নেই। বরং অমিলটা বড় স্পষ্ট। নুড়িগুলো গোল গোল এবং খুব মসৃণ।

পায়ের নিচে পাথরে টুকরোগুলো কড়কড় করে ওঠে। এখানে ওখানে গাছের শিকড় বেরিয়ে আছে। দু'পাশে ছোট ছোট গাছ। মানুষ প্রমাণ উঁচু। ছাতার মত মাথায় পাতার বিস্তার।

এক জায়গায় তিন চারটে মুখ হয়েছে খাদের। এখান থেকে তিন মুখে ছোটে জল। কোনটা ধরে এগোবে তা'রা?

একটু দূরেই একটা জংলা ঝোপ। লাল ফুল ফুটে রয়েছে। কি সুন্দর। পড়ন্ত বেলার আবির কে যেন ছিটিয়ে রেখেছে গাছের মাথায়। হাওয়ায় থেকে থেকে কাঁপছে।

দীপু বলে, বোস কান্না। খেয়ে নি। খুব খিদে পেয়েছে।

একটা বুনো আতা গাছের ছায়ায় বসে দু'জন। দীপু তার ব্যাগ খোলে। পাউরুটি বের করে। ছুরির ফালা দিয়ে মাখন লাগায়। কান্না অবাক হয়ে দেখে।

দু'জনে রুটি খায়। শুকনো রুটি ভাল লাগে না দীপুর। কান্নাকে বলে, কিছু শুকনো পাতা আন। দুধ তৈরী ক'রে খাব। আমার কাছে জমানো দুধ আছে।

কান্না জমানো দুধ কি জিনিষ বোঝে না। শুকনো পাতা ডালপালা সংগ্রহ করে। দুধের কৌটোর মুখ খোলে দীপু। পাথর সাজিয়ে উনোন তৈরী করে। লাইটার বের ক'রে আগুন জ্বালায়। দেখতে দেখতে দুধ টগ বগ্ ক'রে ফুটে ওঠে। কান্না অবাক হয়ে দেখে দীপুর কাণ্ড। দীপু হাসে তাই দেখে। বলে, দেখ্ কেমন দুধ তৈরী হয়েছে। ঠিক যেন গরুর দুধ। বিজ্ঞান মানুষকে কত রকম সুবিধা করে দিয়েছে।

কান্না দুধে চুমুক দেয়।

কিরে, গরুর দুধের মত মনে হয় না ? দীপু জিজ্ঞাসা করে।

কান্না মাথা নাড়ে। না, গরুর দুধের মত মনে হয় না তা'র। সে প্রায়ই গরুর দুধ খায়। তা'র গন্ধ আর স্বাদ আলাদা।

দীপু আবার ব্যাগ গোছায়। রুটি দুধ সব এক এক ক'রে ব্যাগে পোরে। বলে, চল্ কান্না। আমাদের সামনে অনেক কাজ।

দু'জনে এগোতে থাকে। যেন নেশায় পেয়েছে তাদের। দু'পাশের বৈচিত্র্যময় দৃশ্য-চিত্র যেন ওদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। বলছে, এখানে এসো আরো সুন্দর কিছু দেখতে পাবে। আর ওরা এগিয়ে চলছে। এগিয়ে চলছে গাছপালা আর নির্বাক পাথরের ইশারায় ইশারায়। ওদের খেয়ালও হয়নি যে ওরা আর একটা পাহাড়ে এসে পড়েছে কখন।

এ পাহাড়টা অন্য রকম। গাছপালা সামান্য। বড় বড় পাথর এলোমেলো ছড়ানো। কে যেন মুগুর ঘুরিয়ে সব লণ্ড ভণ্ড করে রেখেছে। সেই লণ্ড ভণ্ড হয়ে থাকা পাথরের খাঁজে দু'একটা গাছ। গাছগুলো বড়। কি নাম জানেনা দীপু। দেখেওনি কোনদিন। কান্নাকে জিজ্ঞাসা করে।

কান্না মাথা নাড়ে। না, সে জানেনা এসব গাছের নাম। জঙ্গলে কত রকম গাছ থাকে তা'র আবার নাম হয় নাকি! নাম থাকলেও তা আর ক'জনে খবর রাখে।

চড়াই উৎরাই ভাঙ্গে দু'জনে। মাঝে মাঝে কান্না পাখীর ডাকের নকল করে ডেকে ওঠে। পাখীগুলো ভুল করে জবাব দেয়। কৌতুকে হেসে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে দু'জন। ফাঁকে ফাঁকে দীপু পাথর পরীক্ষা করে। বিছানো কাঁকড়ের মাঝখান থেকে কোয়ার্টজাইট পাথরের টুকরো তুলে নিয়ে দেখে। নাঃ, ঠিক যেমন হওয়া উচিত তেমন নয়। কেননা সে তো যাদুঘরে গিয়ে আদিম মানুষের ব্যবহার করা কম অস্ত্র দেখেনি। দেখেছে দিনের পর দিন। পাশাপাশি

যুগের পর যুগ সাজিয়ে রাখা আছে সে সব অস্ত্র।

ঝর্না অথবা মজে যাওয়া নদী চাই। অথবা একটা গুহা। আদিম যুগের অস্ত্র কিছু পেলে সেখানেই পাবে। কারণ আদিম মানুষ এসব জায়গাতেই বাস করতো। জল বাদ দিয়ে তো মানুষ বাঁচতে পারে না। আর আদিম মানুষের ছিলনা জল বয়ে আনার পাত্র। তা'রা পাত্র তৈরী করার কথা কল্পনাও করতে পারতো না। এই পাত্র তৈরী করতে শেখার মত বুদ্ধি পেতে মানুষকে অপেক্ষা করতে হয়েছে কয়েক লক্ষ বছর!

জল শুধু মানুষের কাছেই অপরিহার্য নয় জীব জন্তুর জীবনেও। তৃষ্ণা পেলে জল চাই। যত দূরেই থাকুকনা কেন জলাশয়ের কাছে আসতেই হবে জীবজন্তুকে। তাই আজকের শিকারীর মত সে যুগের মানুষও জলাশয়ের কাছেই থাকতো। যেমন পেত তৃষ্ণার জল তেমনি পেত হাতের কাছে শিকার।

কিন্তু এই আদ্দিকালের পুরানো পাহাড় খয়ে খয়ে সে যুগের চেহারা নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে। তাই ব'লে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় নি। দীপু নিজেকে নিজে ভরসা দেয়। মনে মনে ভাবে সফল সে হবেই। অনেকে আকস্মিক ভাবে আদিম মানুষের পরিচয় আবিষ্কার করেছে। আর সেখানে দীপু মাথা খাটিয়ে তবে বের করবে। ছোট বলে সে পিছিয়ে যাবে না। ছোটরা কি বড় বড় কাজ করতে পারে না?

কেন পারবে না! আলটামিরার মত বিস্ময়কর গুহা তো দীপুর মত তিনটি ছেলেই আবিষ্কার করেছিল। তা'রা বেড়াতে বেরিয়েছিল। সঙ্গে একটা কালো কুকুর। কুকুরটাকে ভালবাসে তারা। আদর করে নাম দিয়েছে লিকি। প্রতিদিন ওরা বিকেলে লিকিকে নিয়ে বেড়াতে বের হয়। বেড়াবার জায়গাটা ভারী সুন্দর। ঢালাই উপত্যকা। মাঝে মাঝে বড় বড় গাছ। বিকেলে ঠাণ্ডা হাওয়া আসে। গাছের পাতা উড়ে যায়।

লিকিকে হারিয়ে ফেলে তিন বন্ধু। খোঁজাখুঁজি করে।

পাত্তা পায়না লিকির। অবাক হয় তা'রা। কোথায় পথ ভুল করে চলে গেল লিকি !

ডাকাডাকি করতে থাকে। অনেকক্ষণ পরে সারা পায় তা'র। লিকি একটা গর্তের ভিতর পড়ে গেছে। কয়েকদিন আগে ঝড় বয়ে গেছে এই উপত্যকার ওপর দিয়ে। বড় একটা গাছ আছড়ে পড়েছে মাটিতে। বেরিয়ে পড়েছে গাছটার নিচ থেকে একটা গর্ত। পাছে গরু বাছুর পড়ে যায় সেই ভয়ে রাখাল বালকরা মুখে ডালপালা চাপা দিয়ে রেখেছে। লিকি সেখান থেকেই পড়ে গেছে ভিতরে।

এক বন্ধু নিচে নেমে যায়। গুহার মত একটা গর্ত। যত নামে গুহাও যেন তত নিচের দিকে নেমে যায়। উপরে উঠে বন্ধুদের বলে। একে অপরের চোখে তাকায়। তবে কি—

সন্দেহ তাদের বাড়ে। তা'রা বইতে পড়েছে আদিম মানুষের ছবি আঁকার গল্প। তিন বন্ধুর ধারণা তেমনি কোন গুহার সন্ধান পেয়েছে। পরের দিন লণ্ঠন, দড়ি নিয়ে আসে তা'রা। তিন বন্ধু নিচে নামে। গুহার ভিতর নেমে তো বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে যায়। এ যে ইন্দ্রপুরী আবিষ্কার করেছে তা'রা ! গুহার চার দেওয়ালে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে হরিণ, বাইসন, শিং বাগিয়ে ষাঁড়। ছবির মালায় সাজান যেন রূপকথার মায়া-পুরী।

দীপুকে এমনি বিস্ময়কর কিছু একটা আবিষ্কার করতেই হবে। নয়তো সে মুখ দেখাবে কি করে সবাইকে ! সবাই এতক্ষণে জেনে গেছে যে দীপু পালিয়েছে। পাড়ার মানুষ, স্কুলের মাষ্টার মশাইরা পর্যন্ত জেনে ফেলেছেন। সবাই ধিক্কার দিচ্ছে তাকে। শূন্য হাতে ফিরে গেলে সে ধিক্কার শত কণ্ঠ হয়ে তা'র দিকে ছুটে আসবে। সে আর মাথা তুলে চলতে পারবে না।

দেখতে দেখতে সূর্য ঢলে পড়ে পশ্চিম আকাশে। আলো প্রায় নিবে এসেছে। পাহাড়ের আড়ালে সূর্য নেমে যেতেই খেয়াল হয় কান্নার। থমকে দাঁড়ায়। কালো মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। কে যেন মুখের সব রক্ত মুহূর্তে শুয়ে নিয়েছে।

কান্নার মুখ দেখে চমকে ওঠে দীপু। কি হয়েছে কান্না!

কান্না কথা বলেনা। সে যেন কথা বলতে ভুলে গেছে।

দীপু নিজেকে সামলাতে পারে না। বলে, কি হ'ল এমন করে তাকিয়ে আছিস?

আন্ধার এল বটে। কান্না বির বির করে বলে। বড় গম্ভীর অসংলগ্ন শোনায় তা'র কথা। বলে, সাঁঝের আগে গাঁ যেতেক হবে। রাত্রে বাঘ আইসবেক।

বাঘ আসে? দীপু যেন পাথর হয়ে যায়। চারিদিক-নিস্তব্ধ, নির্জন। নির্বাক নিথর তাল তাল পাথর। যেন মৃত দেহ শুয়ে আছে যুগ যুগ ধরে। মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন গাছের সারি। গাছের পাতাও কাঁপছে না। যেন ভয়ঙ্কর ঘটনার ইশারা পেয়ে স্থবির হয়ে গেছে! মৃত্যুর মত গম্ভীর পরিবেশ। দীপুর বুকের ওপর যেন পাথর চেপে বসে। নিঃশ্বাস নিতেও ভুল হয় তা'র।

তারপর সেই ভয়ঙ্কর রাত্রি নামে। ঝিঁ ঝিঁ একটানা ডেকে চলে। দূরে দূরে শয়তানের চোখের মত জোনাকির ঝাঁক জ্বলে। পাথরের আড়ালে খস্ খস্ শব্দ। কখনো রাত-জাগা পাখীর আর্ত কান্না হাওয়ার বুক যেন চিরে চিরে দেয়।

দু'জনে জড়াজড়ি করে ব'সে থাকে পাথরের খাঁজে। কখন যে তা'রা ঘুমিয়ে পড়েছে তা নিজেরাও জানে না।

ঘুম যখন ভাঙ্গে তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে! সূর্য প্রায় মাঝ আকাশের কাছাকাছি। রোদে পাথর তেতে উঠেছে।

দু'জনে বুঝতে পারে তা'রা পথ হারিয়েছে। কোথায় কোন দিকে গ্রাম তা জানেনা। পাহাড়ে পথ খুঁজে বের করাও সহজ নয়। কেননা সেখানে কোন পথই পথ নয়। সেখানে কোন রাস্তা নেই। আদ্দিকাল থেকে পাথরের ঢাল অনড় অচল হয়ে পড়ে আছে। ফাঁকে ফাঁকে গজিয়েছে কত গাছ। দিনে দিনে তা'রা বড় হয়েছে। সূর্যের আলোতে প্রসারিত করে দিয়েছে ডাল-পালা। ফুল ফুটে ফল হয়েছে। সেই ফল ঝ'রে পড়েছে পাথরের বুকে। তারপর বুড়ো

হয়েছে। ধীরে ধীরে মৃত্যু নেমে এসেছে।

কত বৃষ্টি, কত রোদ যুগের পর যুগ এই পাথরে প্রতিহত হয়েছে তা'র কি কোন ঠিক আছে। হাজার হাজার জীবজন্তু জন্মেছে-মরেছে —হারিয়ে গেছে কালের গর্ভে। কিন্তু পাহাড় তেমনি অনড় অচল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কালকের রাত কেমন করে কেটেছে আজ আর তা মনে পড়ে না। পাথরের চাঁইয়ের উপর বসে পড়েছে। হেঁটে হেঁটে দু'জনেই ক্লান্ত পা প্রায় অবসন্ন। চলার সাধ্য ছিল না। ভয় পেয়েছিল দু'জনেই। সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। সেখানে কি আছে তা ওরা জানে না। জনমানবহীন এক পাহাড়ের কোলে বসে আছে। এখানে পশুদের বাস, পরস্পরের সঙ্গে খাদ্য-খাদক সম্পর্ক। তা'রা একে অপরকে নিষ্ঠুরের মত আক্রমণ করে। একে অপরকে হত্যা করেই তা'রা বাঁচে। এই হ'ল মৃত্যুর নিষ্ঠুর লীলাভূমি।

দীপু বসে বসে ভেবেছে। ভেবেছে এমনি অসহায় অবস্থায় কত হাজার হাজার বছর ধরে বাঁচার চেষ্টা করতে হয়েছে মানুষকে। বনের জীবজন্তুব ছিল নানা রকম সুবিধা। গায়ের লোম তাকে বাঁচায় শীত থেকে। হাতের তীক্ষ্ণ নখ, ধারালো দাঁত বাঁচতে সাহায্য করে প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়াইয়ে। মানুষের এসব কিছুই ছিল না। শুধু হাত পায়ের সাহায্যে এই সহজ মৃত্যুর রাজ্যে তাকে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করতে হয়েছে। বেঁচে থাকার আপ্রাণ চেষ্টাতেই প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত হয়েছে। কখন কোন পথে মৃত্যু আসবে জানা ছিল না। প্রতিনিয়ত মৃত্যু হানা দিত তাদের সংসারে।

ভাবতে ভাবতে তা'রা ঘুমিয়ে পড়েছে। টের পায়নি কখন দু'চোখের পাতা এক হয়ে গেছে। না ঘুমিয়ে পড়লে এ রাতকে তাদের মনে হ'ত ভয়ঙ্কর। ধীরে ধীরে অন্ধকার গভীর ঘন হয়েছে। ঘন ঝোপের আড়ালে জ্বলে উঠেছে জোনাকির দীপ। ঝিঁঝিঁর ঐক্যতান পরিবেশকে করেছে ভৌতিক। ওরা কিছুই টের পায়নি গাঢ় ঘুমের আচ্ছন্নতায়। কিন্তু এখন ওদের চলতে হবে। গিয়ে পৌঁছতে হবে

কোন গ্রামে। তবেই ওদের বাঁচার সম্ভাবনা। নয়তো জন মানব-হীন এই পাহাড়ে মৃত্যু ওদের অবধারিত ভাগ্য।

কতবার চমকে উঠেছে দীপু। বড় এক একটা পাথর পার হবার মুখে চমকে উঠেছে। ভেবেছে পাথরটা পার হ'লেই দেখতে পাবে সেই ভয়ঙ্কর জীবটিকে। ডোরাকাটা ছাল গায়ে দিয়ে থাবার ওপর হাড়ির মত মুখ রেখে শুয়ে আছে। ওরা দু'জনে হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে পড়বে তা'র সামনে। বাঘ মুখ তুলে দেখবে। জিব বের ক'রে হাওয়ায় নাচিয়ে স্বাদ বুঝে নেবে। তারপর তা'র লোমশ থাবা লাফিয়ে উঠবে শূন্যে। আছড়ে পড়বে ওদের দু'জনার উপর। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলবে।

তখনো এমনি সূর্য জ্বলবে আকাশে। হাওয়া ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা বলবে পাথরের খাঁজে খাঁজে পাক খেয়ে। পাখীর ডানা ভাসবে আকাশে। দূর দূরান্তের লোকালয় তেমনি সচল থাকবে। গরুর গাড়ী নিয়ে ঘরে ফিরবে গাড়োয়ান। কোলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াবে ফুচকাওআলা। স্কুলের মাষ্টার মশায় ইতিহাসের পাতা খুলে পড়ে যাবেন অতীতের কাহিনী। তখন তাঁ'রা ভাবতেও পারবেন না, তাঁ'র সামনে বসে থাকা ছেলেদের মতই একটি ছেলে ছিল, দীপু যার নাম, অতীতকালের মনুষ্যের ইতিহাস আবিষ্কারের নেশায় ছুটে গিয়েছিল সুদূর শুশুনিয়া পাহাড়ে। আর সে পথ হারিয়ে পরিণত হয়েছে বাঘের শিকারে!

সূর্য যত উপরে ওঠে গরম তত বাড়ে। দরদর করে ঘাম বেরিয়ে আসে গা থেকে। দূরের পাথরের তালগুলো যেন সূর্যের তাপে ঝাঁ ঝাঁ করে। যেন ধোঁয়া পাক খেয়ে উঠছে পাথরের বুক চিরে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ে দু'জনার। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়।

পা আর চলতে চায় না দু'জনার। বড় বড় পাথরের চাঁই বেয়ে উঠে হাঁপায়। পা যেন ভেঙ্গে পড়তে চায়।

তবুও চলছে দু'জনে। দীপু সার্ট খুলে মাথায় বেঁধে নিয়েছে। দারুণ খিদে পেয়েছে তা'র। কাল রাত্ত থেকে কিছু খায়নি তা'রা।

ছোটার সময় বিস্কুটের কৌটো কোথায় কখন ছিট্‌কে পড়েছে খেয়াল করেনি। আছে সামান্য গুঁড়ো দুধ। জল নেই যে একটু গুলে খাবে।

আর চলতে পারেনা দীপু. পায়ের গাঁট যেন ভেঙ্গে পড়ছে। মুখ থুবড়ে পড়বে নাকি? আহা, কোথায় যেন এমনি একখানা ছবি দেখেছিল সে। উট মুখ থুবড়ে পড়েছে মাটিতে সূর্য দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলছে আকাশে—যেন আগুনের গোলা।

খিদে পেটের ভিতর মোচড় মারছে। চোখে সব ঝাপসা দেখায়। পাথরগুলোকে দৈত্যের মুণ্ড বলে মনে হয়। দীপু তো আর কম রূপকথা পড়েনি। হাড়ের পাহাড়ের গল্পটা মনে পড়ে যায়। মানুষের হাড় জমে জমে পাহাড় হয়েছে। সেই হাড়ের পাহাড় ডিঙিয়ে রাজকুমার পেয়েছিল স্বপন কুমারীকে। সামনের নুড়িগুলো যেন তেমনি মানুষের হাড়। একটু বড় বড় নুড়িগুলো নরমুণ্ড।

একটু জল যদি পেত তা'রা! পেট পুরে খেয়ে নিত। এক নিঃশ্বাসে এক বালতি জল শেষ করে দিত। আসবার সময় বাগানে দেখেছিল মালিকে। বালতি বালতি জল তুলছে পাতকুয়ো থেকে। লোকটা এখনও বোধ হয় জল তুলছে। কিন্তু সেতো অনেক দূরে। কত দূরে দীপু তা জানে না।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে কান্না। পাথরের মত শক্ত হয়ে দাঁড়ায়। কান পেতে কি যেন শোন্‌বার চেষ্টা করে। পাথরের বুকের উপর কান লাগিয়ে রাখে।

দীপু বসে পড়ে পাথরটার উপর। আর পারছে না সে। কাঁধের ব্যাগ নামিয়ে রাখে। একটু সমতল জায়গা যদি পেত শুয়ে পড়তো। ঘুম দিত। ঘুমের অচেতনায় যা ঘটে ঘটুক।

খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কান্নার মুখ। তাড়াতাড়ি উপরে ওঠে সে! উপরে উঠে অবাক হয়ে যায়। দেখতে পায় জল। টল্‌টল্‌ ক'রছে সূর্যের আলোতে।

বর্ষাকালে এই পথে জল নেমে যায়। পাথরের উপর দিয়ে দিনের পর দিন গড়িয়ে নামে জল। তারপর ঋতু পরিবর্তনে শুকিয়ে

যায়। খাদে খাদে জমে থাকে জল।

দু'জনে দ্রুত নামতে থাকে। দু'টো পাথর টপ্‌কে চলে আসে জলের কাছে। ছোট একটা ডোবার মত জায়গাটা। জলে নেমে পড়ে। পায়ের পাতা ডুবে যায়। আঁজলায় পুরে জল তুলে খায়।

চলতে চলতে ওরা দু'জন নতুন জায়গায় এসে পড়ে। এ জায়গাটার সঙ্গে অন্য জায়গার যেন কোন মিল নেই। পাহাড়ের বুক যেন কে চিরে দিয়েছে। দু'পাশে উঁচু নিচু পাথরের চাঁই। তারপর খাড়াই পাহাড়। মাঝখানটা ঢালু হয়ে গেছে। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন একটা নদী। এখান থেকে একদিন খরস্রোত হয়ে বয়ে চলতো। উচ্ছল উদ্দাম গতি ছিল তার। যেন হাজার হাজার বুনো ঘোড়া বিপুল জলধারা টেনে নিয়ে যাচ্ছে কোথায়। দিনের পর দিন সে নদী সংখ্যাতীত নুড়ি টেনে নিয়ে এসেছে বুকে ক'রে। তাই তা'র চওড়া প্রসারিত খাদে নুড়ির ছড়াছড়ি। দীপু কয়েকটা নুড়ি হাতে তুলে পরীক্ষা করে। সবগুলোই গোল মসৃণ। হয়তো স্রোতের টানে পরস্পর ঘষা লেগে এমনি মসৃণ হয়ে গেছে।

এ যেন শ্মশানভূমি। কে জানে কত কতদিন আগে এখান থেকে জলের স্রোত বয়ে গেছে! পাথরে পাথর লেগে আওয়াজ উঠেছে ঠুং ঠাং। কেউ সেদিন এই পাথরের সঙ্গীত শোনার জন্য দাঁড়িয়ে থাকেনি। একা একা বয়ে চলেছে যুগের পর যুগ। সে কতদিনকার আগের কথা কে জানে!

কেউ জানেনা কবে ম'রে গেছে এই নদী। বুকে এখন জমে আছে নুড়ির পাহাড়। দু'পাশে ধূসর খাড়া পাথরের পার। এখানে ওখানে গর্ত। বালি চিক্ চিক্ করছে সেখানে।

দুই তীরের পাথর খসে গেছে। দেখে মনে হয় যেন কঙ্কালের সারি দাঁড়িয়ে আছে। কোথাও পাথর লাল। ভয়ানক নরম। হাত দিলে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যায়। কেউ জানে না কত কাল ধরে এখানে এমনি দাঁড়িয়ে আছে।

পড়ন্ত সূর্যের রক্তাভ রোদ। চারিদিক নিশ্চুপ। সবাই যেন

কোন অশরীরীর উপস্থিতি টের পেয়ে মূক পাথর হয়ে গেছে।

দু'পা এগোতেই একটা গুহা। গুহাটা নদীর মত ঢালের অনেকটা উপরে। একটু কষ্ট করলেই ওঠা যায়। গুহাটা অনেকটা উপরে বলে নিরাপদ। কোন হিংস্র জীব-জন্তুর পক্ষে ছুট করে উঠে পড়া সম্ভব নয়।

লোকালয় থেকে তা'রা এখন অনেক দূরে। কেমন ক'রে লোকালয়ে ফিরে যাবে তা জানেনা। দ্রুত অস্ত যাচ্ছে সূর্য! এরপর নামবে অন্ধকার। ভয়ঙ্কর রাত্রি আসবে এই প্রেতময় নিস্তব্ধতায়। পশুর দল বেরিয়ে পড়বে শিকারে।

বাঁচতে হ'লে আশ্রয় চাই। ক্ষুধা তৃষ্ণার কথা মনে পড়ে না দু'জনের। পাথর বেয়ে দু'জনে উঠে যায় ওপরে। গুহার সামনেই একটি পাথরের চত্বর। দুজনে মুহূর্তের জন্য দাঁড়ায় সেখানে। তারপর ঢুকে পড়ে ভিতরে। রাতের জন্য আশ্রয়টা ভাল করে দেখে নিতে চায়।

গুহাটা বড় নয়। একটু এগোলেই ভেতরের দেওয়াল। আসলে পাথরের বড় একটা ফাটল। একখানা পাথর খসে প'ড়ে সৃষ্টি করেছে একটা গর্ত। দু'জন লোক গুহাটার ভিতরে সহজেই বাস করতে পারে। দীপুর পড়ার ঘরটা এর থেকে বড়। দেওয়ালগুলো ফাটা ফাটা। বিষাক্ত সাপ থাকতে পারে। তাদের আগেই তাড়িয়ে দেওয়া ভাল। দীপু পাথর তুলে দেয়ালে ঠোকে। যদি আওয়াজ পেয়ে পালায়। গম গম করতে থাকে গুহা। বাইরে থেকে প্রতিধ্বনি ফিরে আসে। দীপু ভাবে সে তো আর কম শিকার কাহিনী পড়েনি। শিকারীরা তাঁবুর কাছে আগুন জ্বালিয়ে রাখে। আগুনকে ভয় পায় বনের জানোয়ার। ভরসা ক'রে কাছে ঘেঁষে না।

রাত কাটাতে হ'লে জায়গাটাকে নিরাপদ করতে হবে সবার আগে। বলাতো যায় না কখন কোনদিক থেকে বিপদ আসবে। ভবিষ্যতের সব রকম প্রয়োজনের জন্য প্রস্তুত থাকাকেই তো বলে সভ্যতা।

কিন্তু কোথায় আগুন পাবে তা'রা? লাইটারটা ভুলে ফেলে এসেছে জঙ্গটার সামনে।

আদিম মানুষ এই আগুনের ব্যবহার শিখেছিল কয়েক লক্ষ বছর আগে। হঠাৎ তা'রা বুঝতে পেরেছিল আগুনের প্রয়োজনীয়তা। এর আগে তা'রা শুধু আগুন দেখেছে। দেখেছে আগ্নেয়গিরির আকস্মিক অগ্ন্যুৎপাত। দেখেছে বনে হঠাৎ দাবানল জ্বলে উঠতে। পশুগুলো প্রাণভয়ে পালিয়েছে। সিংহের গা ঘেঁষেই হয়তো ছুটেছে হরিণ। ম্যামথের পর্বতের মত দেহের পাশ দিয়ে তীরবেগে বেরিয়ে গেছে হায়না। তাদের পাশে পাশে প্রাণ ভয়ে ছুটেছে আদিম মানুষের দল।

তারপর আদিম মানুষ আগুনের মূল্য বুঝেছে একদিন। তখন সে আগুন থেকে জ্বলন্ত কাঠ টেনে এনে গুহায় তুলেছে। দিনের পর দিন কাঠের জোগান দিয়ে সে আগুন বাঁচিয়ে রেখেছে। তখন জীবন তাদের হয়েছে অনেক নিরাপদ। শীতার্ত দিনগুলোতে গুহাগুলো হয়ে উঠতো উষ্ণ। উলঙ্গ মানুষরা আগুনের কাছে বসে উপভোগ করতো উষ্ণতার আরাম।

তারপর তা'রা লক্ষ্য করেছে কাঠে কাঠ ঘষা লেগে কেমন আগুন জ্বলে ওঠে! পাথরে পাথর ঠুকলে কেমন আগুনের ফুলকি ওঠে। তখন সে পাথরে পাথর ঘষে আগুন জ্বালিয়েছে।

দীপু নিচু থেকে একখানা পাথর ছুড়ে দেয়। লুফে নেয় কান্না। অনেকগুলো পাথরের টুকরো তা'রা জমা করে নিতে চায়। অন্ততঃ পাথ ছুড়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে পারবে।

দীপু পাথরে পাথর ঘষে। কই আগুন তো জ্বলে উঠছে না। তবে কি আগুন জ্বালবার পাথর অন্য রকম? তা'র মনে পড়ে যায় চক্মকি পাথরের কথা। এগুলোতো আর চক্মকিপাথর নয়।

হঠাৎ দীপুর খেয়াল হয়। যখনি কান্নার দিকে পাথর ছোড়ে তখনি ঝক্ ঝক্ করে বেজে ওঠে পকেট। সে তাড়াতাড়ি পকেটে হাত দেয়। আশ্চর্য তার পকেটেই তো লাইটারটা রয়েছে।

দীপুর মনে পরে গত কাল দুপুরে দুধ তৈরী করতে সে আগুন

জ্বেলে ছিল। তখন পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছে তারপর ভুলে গেছে।

তাড়াতাড়ি নিচে নেমে আসে কান্না। যেমন করে হোক কিছু শুকনো কাঠ সংগ্রহ করতে হবে তাদের। গুহার মুখে আগুন জ্বালিয়ে রাখবে তা'রা। যতটা পারে ডালপালা ভেঙ্গে নেয়। কাঁটার ঝোপ লাঠির মাথায় বাঁধিয়ে উপরে তুলে আনে। এনে জড় করে গুহার মুখে। ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা মনেও আসে না।

সূর্য নিভে যায়। দ্রুত কালির পোঁচে ঢেকে যায় দূরের পাহাড়গুলো। অন্ধকার নামে। দু'জনে উঠে পড়ে উপরে। তারপর? আর কোন কাজ নেই। এখন সারা রাত জেগে বসে থাকতে হবে। বসে থাকতে হবে বুকের নিচে অজানা এক ভয় নিয়ে। আর কোন আওয়াজ শুনলেই চমকে উঠতে হবে। আর কিছু করার নেই ওদের সামনে।

কান্না তীর ধনুক এখনো হাতছাড়া করে'নি। দেয়ালের পাশে নামিয়ে রাখে। ঠেস দিয়ে বসে দেওয়ালে। এতক্ষণে সে একটু বিশ্রাম নিতে চায়।

দীপু বাইরের দিতে তাকায়। খোলা আকাশ। অন্ধকার আকাশে যুঁই ফুলের মত কত তারা। দূরে ছায়াপথ। কে জানে সে কত দূর! যুগ যুগান্ত ধরে চললেও বোধহয় পৌঁছানো যায় না ওখানে।

দীপু মনে মনে ভাবে এওতো হ'তে পারে যে আজ থেকে পুরো এক লক্ষ বছর আগে ঠিক এমনিভাবে এখানে বসেছিল কোন আদিম মানুষ। তখন শেষ হিম-যুগ চলছে পৃথিবীতে। হু হু করে হিমার্ত হাওয়া ছুটে আসছে। এসে যেন চাবুকের মত আছড়ে পড়ছে মুখের ওপর। শির শির করছে মেরুদণ্ড। হাত পা অবশ হয়ে যেতে চাইছে। নিচের নদীর জল জমে কঠিন বরফ হয়ে গেছে। অন্ধকার মনে হয় কেউ যেন সাদা চাদর বিছিয়ে রেখেছে।

গুহার মুখে তারা আগুন জ্বালিয়ে নিয়েছে। কয়েকটি মানুষ সেই আগুনের সামনে জড়াজড়ি করে বসে আছে। অবশ্যই আজকের মত

মানুষ নয় তা'রা। চোয়াল সামনের দিকে বাড়ানো। কপাল পিছন দিকে ঠেলে দেওয়া। কপালের খাঁজে ধারালো তরবারির মত তীক্ষ্ণ হিংস্র চোখ। উলঙ্গ তা'রা। মাথায় জটপাকানো চুল, মুখে দাড়ি।

জড়াজড়ি করে বসে আছে তা'রা। রাত্রির নিস্তব্ধ অন্ধকার কেঁপে কেঁপে উঠছে হিংস্র জানোয়ারের চিৎকারে। নিচ থেকে হয়তো এই মুহূর্তে ছুটে গেল একটা হায়না। তার পিছনে গর্জন করতে করতে গেল একটা বাঘ।

গুহার মানুষগুলো আগুনের পাশে বসে আছে। হাড় থেকে মাংস দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। এক কোনে একটি নারী বসে আছে। সে সবার মা। জরাগ্রস্ত দেহ। একটি চোখ কানা। শিকার করতে গিয়েই সে চোখটি হারিয়েছে। চোখ থেকে সব সময় জল কাটে। মুখের একদিক ভেজা। মাঝে মাঝে নোঙরা হাত তুলে মুখ পোঁছে। কেউ এক টুকরো মাংস ছুড়ে দেয়নি তা'র দিকে। তাই সে এক কোনে বসে কাঁদছে।

সে সবার দয়ার উপর বেঁচে আছে। শিকারে বের হ'তে পারে না বলে কেউ খাবারের ভাগ দেয় না। এদের ভুক্তাবশিষ্ট হাড় গোড় যা থাকে তাই সবার শেষে বসে বসে লেহন করে। অনেক সময় মাংস খাবলে খেয়ে নিয়ে হাড়টা ছুড়ে দেয় বুড়ির দিকে। তার উপর লাফিয়ে পড়ে বুড়ি। অচল দাঁত দিয়ে তাই ছাড়িয়ে খাবার চেষ্টা করে।

সব থেকে শক্তিমান পুরুষটি একপাশে ঠেস দিয়ে বসে আছে। আগুনে গুহা বেশ উষ্ণ। সে ঠাং দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। দেওয়ালে মাথা ঠেস দিয়ে বসে আছে। পেট ভরা থাকাতে তা'র ঝিমুনি এসেছে। সে সবার আগে খেয়েছে। শক্তিমান বলে সবাই তাকে সমীহ করে। সবার আগে ভাগ পায়। ভাল জিনিসটা সেই খায়। তা'র মুখোমুখি হতে সাহস করেনা কেউ।

ওদের মাংস খাওয়া শেষ হয়। আগুন তেমনি জ্বলছে। বাইরে অন্ধকার। আকাশে তারা। একটা নক্ষত্র নেমে আসে দ্রুত।

তারপর নিভে যায়।

এই সব কিছুই দেখছে না। ওরা পাথরে পাথর ঠুকছে। পাথর ঠুকে পাথরের পর্দা খসিয়ে ফেলছে। এমনি করেই ওরা ওদের শিকারের অস্ত্র তৈরী ক'রে। এদেরি বলে পুরা-প্রস্তর যুগের মানুষ। এমনি ক'রে পাথুরে অস্ত্র তৈরী করে তাই দিয়ে করে শিকার।

বাইরে অন্ধকার। কত রাত আন্দাজ করতে পারে না দীপু। তা'র সঙ্গে ঘড়ি নেই। কখন যেন ঝিমুনি এসেছিল তা'র। এখন আগুনটা ভাল করে জ্বালিয়ে দেওয়া দরকার। শ্রান্তিতে কখন ঘুমিয়ে পড়বে কিছু ঠিক আছে?

দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠে। গুহার ভিতর আলোয় আলো হয়ে যায়। গুহার দেওয়াল ফাটা ব'লে মাকড়সার জালের মত মনে হয়। কান্না কখন পেটের ভিতর ছু'হাটু খুঁজে ঘুমিয়ে পড়েছে। তীর-ধনুক এখনো হাতে ধরা!

দীপু বসে বসে ভাবে আদিম মানুষের কথা। কেমন করে তা'রা অস্ত্র পেল, শিকার করতে শিখলো সেই সব কথা। মানুষের হাতে প্রথম যে অস্ত্র আসে তা হ'ল লাঠি। প্রথমে গাছের ডাল ভেঙ্গে ভেঙ্গে ছোট খাটো কাজ সারতো। এমনি করেই তা'রা লক্ষ্য করেছে সূচাগ্র কাঠের সুবিধা। লাঠির মাথা সরু হ'লে তা দিয়ে সহজেই কন্দ, গাছের কচি মূল তুলে খাওয়া যায়। ছোট খাটো জন্তু শিকার করা যায়। মানুষ এমনি করেই বুঝতে পেরেছে লাঠির মাথা সরু থাকার উপযোগীতা। সেই লাঠি ক্রমশঃ বর্শায় রূপান্তরিত হয়েছে।

ফ্লিট পাথর কেটে গেলে প্রান্ত রেখা খুব ধারালো হয়। তা দিয়ে গাছের ডাল সহজেই কেটে সরু করা যায়। আদিম মানুষ তা বুঝতে পেরে নদীর পার থেকে তুলে আনতো। এমনি করেই তা'র মাথায় এসেছে অস্ত্র তৈরীর পরিকল্পনা।

হয়তো প্রথম তা'রা ফ্লিট পাথর আছড়ে টুকরো করে তাই দিয়ে কাজ সারতো। ব্যবহার করতে করতে উপলব্ধি করেছে এর উপযোগীতা। তখন পাথরের পর্দা খসিয়ে তৈরী করেছে। তাতে

তাদের শিকারে বেড়েছে দক্ষতা। অভিজ্ঞতায় অস্ত্র হয়েছে নিপুণ।

মানুষের এই সময়কার ইতিহাসের নাম প্রস্তর যুগ। অথবা পাথুরে যুগ। এই পাথুরে যুগকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন পণ্ডিতরা। প্রায় কুড়িয়ে পাওয়া পাথর যখন ব্যবহার করতো সে যুগ হ'ল পুরা-প্রস্তর যুগ। সেই মানুষ যখন পাথরের পর্দা খসিয়ে কাজ করেছে তার নাম মধ্য-প্রস্তর যুগ। সবার শেষে নব-প্রস্তর যুগ।

নব-প্রস্তর যুগের পাথুরে অস্ত্রের যোগ্যতা অসাধারণ। নব-প্রস্তর যুগে তৈরী কুঠার দিয়ে বড় বড় গাছ কেটে ফেলা যায়। পণ্ডিতরা হাতে কলমে পরীক্ষা করেছেন এর।

দীপু ভাবে শুশুনিয়াতেও কি এমনি ক'রে মানুষের বিবর্তন হয়নি! যুগের পর যুগ মানুষ একটু একটু ক'রে দক্ষ হয়েছে। ক্রমশঃ পাথুরে অস্ত্র হয়েছে মসৃণ। তারপর মাটি পুড়িয়ে মানুষ শিখেছে পাত্র তৈরী করতে। শিখেছে সে চাষ করতে। ক্রমশঃ বুনো স্বভাব কাটিয়ে পত্তন করেছে যৌথ জীবনের। তৈরী হয়েছে সমাজ আর নানা অনুশাসন।

একে একে মানুষের হাতে এসেছে তা'র বাঁচার উপাদান। গুহা ছেড়ে গ্রাম তৈরী করেছে। গ্রামের পাশের মাঠেই চাষ করে। বনের পশু ধরে এনে বশ ক'রে। গরু দুধ দেয়। ঘোড়া দূর দূরান্তে নিয়ে যায়। অভিজ্ঞতায় চাষ উন্নত হয়। হাতে আসে প্রচুর খাদ্য সামগ্রী। তখন সে অবসর পেয়েছে। এগিয়ে গেছে নগর সভ্যতার দিকে। জেগে উঠেছে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার মুকুটমণি মোহেনজোদড়ো। শুরু হয়েছে নাগরিক জীবন, যার পরিচয় পাণ্ডুরাজার ঢিপি খুঁড়ে বের করা হয়েছে

তার থেকেও বেশি ভাল লাগে কল্পনার ঘোড়া ছেড়ে দিতে। এখানেই যদি সে পেয়ে যায় আদিম যুগের জীবন্ত মানুষকে! পায়ে পায়ে দীপুর মতই পাথর বেয়ে উপরে উঠে আসবে। পিঠে ঝুলছে নিহত হরিণ। হাতে হরিণের একটা লম্বা সূচালো রক্তাক্ত সিং। হরিণের সিংকে অস্ত্র করে সে শিকার করেছে হরিণ।

হয়তো হরিণের চলার পথে গর্ত করে পেতে রেখেছিল ফাঁদ।

ছুটতে ছুটতে মুখ থুবড়ে পড়েছে হরিণ। অমনি ছুটে গিয়ে হরিণের ধারালো সিং বসিয়ে দিয়েছে হরিণের পেটে। তারপর হরিণটাকে তুলে নিয়েছে পিঠে। সর্তক পায়ে চলে এসেছে গুহার নিরাপদ আশ্রয়ে। তাও কি সম্ভব ? দীপু নিজের মনে মনে ভাবে। এ তো লক্ষ বছর আগের মানুষ। আজ শত মাথা খুটলেও তাদের জীবন্ত পাওয়া যাবে না। সঙ্গে সঙ্গে তা'র মনে পড়ে ইয়েতির কথা। ইয়েতিও তো মানুষের মত! হয়তো মানুষ থেকে তা'রা অনেক বড়। হয়তো সমতলবাসীদের সঙ্গে বনিবনা করে না-থাকতে পেরে ক্রমশঃ পিছিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত আশ্রয় জুটেছে তাদের হিমালয়ের বরফ জমা প্রান্তরে। যেমন তা'রা ধাপে ধাপে পিছিয়েছে তেমনি ধাপে ধাপে পরিবর্তন হয়েছে। ক্রমশঃ অভ্যস্ত হয়েছে বরফের রাজ্যে বাস করতে। তাই তা'রা আজ বরফের দুর্ভেদ্য দেশে এক রহস্যময় মানুষ।

তবে শুশুনিয়াতেও বা আদিম মানুষ বেঁচে থাকতে পারবে না কেন ?

তা যে সম্ভব নয়, দীপু তা ভাল করেই জানে। শুশুনিয়ার মানুষ ধাপে ধাপে বিবর্তনের পথে এগিয়ে গেছে। তা'র পাশে কান্না ঘুমিয়ে আছে। কে জানে তাদেরই কোন বংশধর হয়তো সে। নিজেও তো তাই। চলার পথে অনেক জাতির রক্ত মিশ্রিত হয়েছে তাদের শিরায় এই যা পার্থক্য।

কারা যেন দূরে খিল খিল করে করে হাসে। চমকে ওঠে দীপু। মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে। এমন করে এই গভীর রাত্রে কে হাসে জনমানবহীন প্রস্তর ভূমিতে? তবে কি অশরীরী আত্মারা হাসছে দীপুর চিন্তা দেখে।

আগুন প্রায় নিভে এসেছে। অন্ধকার পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে। অন্ধকারতো নয় যেন ভয়ঙ্কর এক থাবা। পায়ে পায়ে যেন এগিয়ে আসছে গুহার দিকে। পা টিপে টিপে এসে পৌঁছবে গুহার মুখে। মুখ বাড়িয়ে দেখে নেবে দীপুদের। তারপর? সেই লোমশ

তীক্ষ্ণ নখের থাবা আছড়ে পড়বে। মুহূর্তে তুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলবে দূরে। দেহটা শূন্যে লাফিয়ে উঠে পাক খেয়ে ছিটকে পড়বে নিচের কাঁকরময় উপত্যকায়। তারপর আর কিছু নেই। অন্ধকার আর অন্ধকার।

কান্না ঘুমিয়ে আছে। দীপুর ইচ্ছে হয় উঠে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে। নয়তো সে আর থাকতে পারছে না। ভয়ানক ভয় করছে তা'র।

তবুও কান্নাকে জাগায় না দীপু। সারা রাততো আর দু'জনে জেগে বসে থাকতে পারবে না। অসতর্ক মুহূর্তে ঘুম এসে কেড়ে নেবে এ জগত থেকে। তখন যে বিপদ আসবে তা অজ্ঞাতেই আসবে। তার থেকে এক জনের জেগে থাকাই ভাল। জেগে থাকতে হবেই সে যেমন করে হোক। আপাতত কান্নাই ঘুমোক। পরে ওকে তুলে দিয়ে দীপু নিজে ঘুমিয়ে নেবে।

ও কিসের শব্দ। কেউ যেন পায়ে পায়ে এগিয়ে আসছে তাদের গুহার দিকে। খস্ খস্ করে থাবা ঘষছে পাথরে। হিংস্র জীবজন্তু নয়তো? গন্ধে গন্ধে এগিয়ে এসেছে এত দূর। হয়তো ওদের পিছনে পিছনে এসেছে। ওরা টের পায়নি। দীপু এ রকম শিকার কাহিনী পড়েছে। শিকারী খুঁজছে শিকারকে। আর শিকার দিনের পর দিন এমনি পিছনে চলেছে শিকারীর অসতর্ক মুহূর্তের আশায়। সুযোগ বুঝে মুখোমুখি হয়েছে। তখন শিকারী যদি মুহূর্তে প্রস্তুত না হ'তে পেরেছে তবে তা'কেই লুটিয়ে পড়তে হয়েছে মাটিতে। হাতের বন্দুক ছিটকে গেছে দূরে। থাবার নিচে কয়েকবার থর থর করে কেঁপে চিরকালের মত স্থির হয়েছে রক্তাক্ত দেহ।

অথচ আদিম যুগের মানুষও সামান্য পাথুরে অস্ত্র নিয়ে বিশালকায় হিংস্র জন্তুর মুখোমুখী হয়েছে। কত সর্তকতা আর দক্ষতা দরকার হয়েছে তাদের। তাদের সুযোগ ছিলনা আজকের মত অনেক দূর থেকে অব্যর্থ বুলেট ছুঁড়ে দেওয়ার। তাদের যেতে হয়েছে একেবারে শিকারের কাছাকাছি। তারপর একটা পাথুরে কুড়াল বা পাথুরে বল্লমের আঘাতেই তো মাটিতে লুটিয়ে পারেনি এক একটা

জানোয়ার! আঘাতের পর আঘাত করতে হয়েছে। তবে পর্য্যুদস্ত হয়েছে সেই পশু। ততক্ষণে তা'র তীক্ষ্ণ নখের আঘাতে অথবা ধারালো দাঁতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে কয়েকটি মানুষ।

এমনি অসম প্রতিযোগীতায় যুঝতে হয়েছে বলেই না মানুষ দ্রুত এগোতে পেরেছে। আদিম মানুষ তাদের দেহের দুর্বলতা জয় করেছে বুদ্ধি দিয়ে। তাই তা'র বুদ্ধি হয়েছে ক্রমশঃ ক্ষুরধার। নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টা করেছে যত তত হয়েছে তা'র মস্তিকের চর্চ্চা। ক্রমশই মাথার ঘিলু হয়েছে বেশী। মাথার খুলিকে দিতে হয়েছে অতিরিক্ত ঘিলু সংরক্ষণের জায়গা। পরিবর্তন হয়েছে মাথার। কপাল এগিয়ে এসেছে সামনের দিকে।

আগুনে ঝলসে মাংস খেয়েছে আদিম মানুষ। এই খাদ্য অভ্যাস পরিবর্তনেও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে তাদের মাথার। মাংস ঝলসে খাওয়াতে দাঁতের ব্যবহার হয়েছে কম। তাই দাঁত তা'র চরিত্র পরিবর্তন করেছে স্বাভাবিক ভাবে। চোয়াল গিয়েছে ধাপে ধাপে পিছন দিকে সরে।

দীপুর দু'চোখে ঘুম আসে। ভয়ানক খিদে পেয়েছে তা'র। সারা দিন কিছুই খাওয়া হয়নি। নাড়ি ভুড়ি যেন হজম হয়ে যাচ্ছে পেটের মধ্যে। কোন দিন এক বেলাও না খেয়ে থাকে নি। চোখ খুলতেই মা টেবিলে খাবার সাজিয়ে দিয়েছেন। দীপু স্নান করতে গেছে। মাছের ঝোল ভাত খেয়েছে। দই পেয়েছে। কখনও সখনো একটু ফল। মা বলেছেন, দীপ আর একটু মাছ খা। মাছটা খুব ভাল। দীপু আঁৎকে উঠেছে। না মা, আর খেতে পারবনা। স্কুলের দেরী হয়ে যাবে যে। মা ধমক দিয়েছেন। বলেছেন, কেন দেরী হবে। সবে তো সাড়ে দশটা বাজে। কতটুকুই বা পথ।

স্কুলে যাবার সময় মা হাতে পয়সা গুঁজে দিয়েছেন। বলেছেন, খারাপ কিছু খেওনা কিন্তু! রাস্তার খোলা খাবার খেতে নেই, ওতে অসুখ হয়। দোকান থেকে দুটো মিষ্টি কিনে খেও।

সেই দীপু আজ সারা দিন অভুক্ত। কে জানে তাকে আরো কত

দিন অভুক্ত থাকতে হবে। তা'রা পথ হারিয়ে ফেলেছে। কোথায় চলেছে তা তা'রা জানেনা। কাল সকাল হ'লেই আবার যাত্রা করতে হবে। যত কষ্টই হোক দিনের পর দিন হাঁটতে হবে। একটি গ্রামের সন্ধান পেলেই ওদের মুক্তি।

কে জানে কতদিন তাদের এই জনমানবহীন পাহাড়ে ঘুরতে হবে। হয়তো ক্ষুধার জ্বালা মেটাতে তাদের ঘাস পাতা খেতে হবে। এমন হ'তে পারে ধাপে ধাপে পিছিয়ে যেতে হবে। তাদেরও পাথরের টুকরো ভরসা করে শিকারে নামতে হবে ছোটখাট জীব-জন্তু শিকার করে আদিম মানুষের মতই ঝলসে খেতে হবে।

মানুষ বাঁচার জন্য কি-না করে কি-না খায়।

অথচ তাদের মরতেই হয়। কত শত জীবজন্তু এই পাহাড়ে দিনের পর দিন জন্ম নিয়েছে। আবার তা'রা একদিন হারিয়ে গেছে। অথচ সবাই তা'রা বাঁচতে চেয়েছে। বাঁচার জন্য আপ্রাণ লড়াই করেছে। ক্ষুধার তাড়নায় নিজের সঙ্গীকেই খেয়ে ফেলেছে। বাঁচতে হবে! জীব জগতে এই তো প্রধান ধর্ম।

মানুষও একসময়ে এমনি ছিল। পাওয়া গেছে মানুষের মাথার কঙ্কাল। মাথায় আঘাতের দাগ। অনেকে অনুমান করেন মাথার ঘিলু খাবার জন্যই মাথা ফাটিয়েছে কেউ। ভাবতেও কেমন যেন করে ওঠে দীপুর ভিতরটা।

আজ সেই মানুষ কত এগিয়েছে। মনুষ্যত্বের মহিমায় সে কত উজ্জ্বল। অপরের সুখেব জন্য কত মানুষ জীবন উৎসর্গ করেন। দেশের জন্য দশের জন্য এমনি সব কিছু যে ত্যাগ করেন তাঁকেইতো মানুষ শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে বলে মহাপুরুষ।

চারদিক বড় বেশি চুপ চাপ। দীঘির জলের মত এই নীরবতা। দূর আকাশে অসংখ্য তারা। দীপু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। একটা তারা খসে পড়ে। দ্রুত তারাটা নিচের দিকে নামতে থাকে। তারপর হঠাৎ নিভে যায়।

মা বলতেন, দীপু তারা পড়া দেখতে নেই। ওতে অমঙ্গল হয়।

সত্যি ? দীপু বিশ্বাস করে না। তা'র মা কত অবাস্তব কথা বলেন যা হয় না। শুনে দীপুর বাবা হাসেন। বলেন, কিগো এখনো তোমার এসব বিশ্বাস গেল না! এক চোখে হাত দিলে কি হয় ? কিছু না।

সত্যি কিছু হয় না। দীপু ছোট বয়সে মায়ের চোখের আড়ালে কতবার এক চোখে হাত দিয়ে দেখেছে। কই সে তো কানা হয়নি। দিব্যি দেখতে পাচ্ছে কেমন তারাটা দ্রুত নিচের দিকে নেমে আসছে।

দীপু দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছে। চোখ কেমন জড়িয়ে আসতে চায়। পা দুটো টন্ টন্ করছে। কম তো আর হাঁটেনি সে পায়ের পাতা যেন খসে পড়ছে। গাঁট দুটো টাটাচ্ছে। দীপু পায়ের জুতো খোলে।

ঠাণ্ডা হাওয়া এসে পায়ে লাগছে। কে যেন হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। —আঃ কি আরাম। এ ক'দিনে একবারো জুতো খোলার সুযোগ হয়নি তা'র। জুতোর ভিতরে রাশি রাশি বালি। দীপুর মা যদি দেখতেন বকতেন। বলতেন, জুতোর ভেতর বালি! কি ক'রে যায় ? নিশ্চয় অসভ্যতা করেছো।

আস্তে আস্তে চোখ বুজে আসে দীপুর। দীপু জোর করে চোখ খুলে রাখতে চায়। না, সে ঘুমাবে না। কিন্তু কখন যে ঘুম দু'চোখের পাতা এক করে দেয় টেরও পায়না দীপু।

দীপু ঘুমিয়ে পড়ে। কত গ্রাম জনপথ হেঁটে চলে যায়। পিছিয়ে যেতে থাকে যেন হাজার হাজার বছর আগের কোন এক দেশে। পিছুতে পিছুতে সে চলে যায় কয়েক লক্ষ বছর আগে। সেই আদ্দিকালের মানুষের দেশে।

বড় একটা গাছ। তা'র মা সেই গাছটায় বসে আছে। দীপু একটুও অবাক হয়না এমন দৃশ্য দেখে। সে তো কয়েক লক্ষ বছর আগে চলে গেছে। তখন এমনি গাছেই তো থাকতো মানুষ! তার— পরে সে আশ্রয় নেয় গুহায়। এই গাছ ছেড়ে গুহায় যেতে মানুষকে কয়েক লক্ষ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে তাতে আর সন্দেহ কি।

গাছটার কাছেই একটা জলা। তা'র বাবা সেই জলে নেমে শামুক

তুলছে। শামুক তুলে তুলে ছুড়ে দিচ্ছে উপর দিকে। দীপুর মা লুফে লুফে নিচ্ছে সেই শামুক। শক্ত একটা পাথর দিয়ে ঘা মারছে। খোলসটা গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। মাথা পিছন দিকে হেলিয়ে শামুকটা মুখের ভিতর ফেলে দিচ্ছে তা'র মা। তারপর কচ্‌মচ্‌ করে চিবিয়ে খাচ্ছে। মাঝে মাঝে চিবানো মাংসের টুকরো পুরে দিচ্ছে দীপুর মুখে। সেও সেই চিবানো মাংস গক্‌গক্‌ করে গিলছে।

তা'র বাবা তেমনি করে জলে শামুক খুঁজছে। একটা মাছ ধরেছে সে। সেটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছে শামুক কুড়ানো ভুলে গিয়ে। মুখের দু'পাশ দিয়ে তাজা মাছের রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। জট-পাকানো চুল মুখের ওপব এসে পড়েছে। দেখতে হয়েছে বীভৎস।

হঠাৎ তা'র মা ছোঁ মেরে তুলে নেয় তাকে। দ্রুত উঠে যায় গাছে। সে মাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরে। গাছের অনেকটা উপরে উঠে একটা শক্ত ডালে বসে পড়ে।

তা'র বাবাও উঠে এসেছে গাছের উপর। নিচে খুব বড় একটা দাঁতাল বাঘ। গক্‌ গক্‌ করে আওয়াজ করছে মুখে। লোভে চক্‌চক্‌ করছে গোল বড় বড় দুটো চোখ। ঝক্‌ ঝক্‌ করছে বাইরে বেড়িয়ে থাকা তীক্ষ্ণ ধারালো দুটো দাঁত।

শক্ত একটা গাছের ডাল টেনে ভেঙ্গে ফেলে তা'র বাবা। গাছের ডালে ঝুলে বাঘটার মুখের সামনে নাড়ে ডালটা। মুখে শব্দ করে হুম্‌...হুম্‌...হুম্‌। তা'র মা গাছের ডাল নাড়ায় আর শব্দ করে।

বাঘটা ভয় পায়না একটুও। লাফিয়ে উঠতে চায় গাছে। লাফ দিলেই মুখের ওপর ডাল দিয়ে ঘা'মারে ওর বাবা। গর্জন করে নিচে পড়ে যায় বাঘটা। রাগে গড়্‌ গড়্‌ করে। নখ দিয়ে মাটি আঁচড়ায়। তারপর ছুটে যায়।

একটা শেয়াল হয়তো কারো কাছে তাড়া খেয়ে ছুটে যাচ্ছিল এই পথে। এসে পড়ে বাঘটার মুখোমুখি। মুহূর্ত্তে বাঘটা ঝাঁপিয়ে পড়ে। তীক্ষ্ণ দাঁতের আঁচড়ে ভুড়ি ফেঁসে যায়। বাইরে বেরিয়ে আসে নাড়ি ভুড়ি। লুটিয়ে পরে মাটিতে।

বাঘটা কণ্ঠনালিতে মুখ বসিয়ে দিয়ে রক্ত চোষে।

ওর বাবা হুড় মুড় করে নেমে যায় মাটিতে। গাছটার নিচেই জমা করা আছে অনেক পাথর। একটা একটা করে পাথর তুলে ছুড়তে থাকে বাঘের গায়ে।

বাঘটা তেড়ে আসে। ওর বাবা এক লাফে গাছের ওপর উঠে আসে। ক্ষুব্ধ বাঘটা গর্জন করতে করতে ফিরে যায় নিহত শেয়ালের কাছে। গিয়ে কচ্ কচ্ করে মাংস খায়। আবার ওর বাবা নিচে নেমে যায়। পাথর ছোড়ে তাক করে।

এমনি লুকোচুরি খেলা চলতে থাকে অনেকক্ষণ। ওর মা ওকে বসিয়ে দিয়েছে গাছের ফোঁকরের মধ্যে। সেও সর সর করে নিচে নেমে যায়। দু'জনে ধুমধাম পাথর ছোঁড়ে। এক একটা পাথর গিয়ে আছড়ে পরে বাঘটার গায়। কখনো মাথায় কখনো লেজে কখনো পিঠে পড়ে পাথর। একটা পাথর ওব বাবা টিপ করে লাগিয়ে দেয় একেবারে বাঘের নাকের ডগায়। নাকের ডগা থেতলে যায়। রক্ত বেরিয়ে আসে! গোঁ গোঁ করতে করতে ছুটে পালায় বাঘটা। অমনি তা'র বাবা ঠ্যাং ধরে বাঘের ভুক্তাবশিষ্ট টেনে আনে গাছের ওপর! একটা গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়ে ওর মায়ের পানে তাকিয়ে বিজয় উল্লাসে হাসতে থাকে।

ওর মা এগিয়ে আসে। কলজেটা টেনে ছিঁড়ে নেয়। একটু ওর বাবাকে দেয়। নিজে একটু খায়। গাছের কোটরে বসে সে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে কখন সে একটু ভাগ পাবে।

কলজে চিবোতে তা'র ভালই লাগে। বেশ নরম সুস্বাদু। খেতেও তা'র সুবিধা হয়। সে পিট পিট করে দেখতে থাকে।

এমনি সে তাকিয়েই থাকে। দিনের পর দিন গড়িয়ে যায়। বছরের পর বছর। কতবার সূর্য উঠে আবার গড়িয়ে গেল পশ্চিম আকাশে কে তা'র হিসাব রাখে? লক্ষ লক্ষ বছর কেটে গেল নাকি? অসম্ভব নয়।

চারিদিকে বরফ। পাহাড়ের চূড়োগুলো যেন সাদা টুপি পরে

বসে আছে। অভ্রের দানার মত বরফের গুঁড়ো ভাসছে হাওয়ায়। শন্ শন্ করে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে চলেছে বাইরে।

তা'রা জড়াজড়ি করে বসে আছে গুহার মধ্যে। সবার গায় পশুর চামড়া। গুহার মুখে আগুন জ্বলছে। বেশ গরম গুহাটা। একজন এক পাশে শুয়ে আছে লোমশ হাতি থেতলে দিয়েছে তা'র পা। সে যন্ত্রণায় ছট্ ফট্ করছে। মাঝে মাঝে কঁকিয়ে উঠছে। একজন গাছের পাতা ও লতা নিঙড়ে দিচ্ছে।

বাইরে আগুনে ঝলসানো হ'চ্ছে মাংস। দু'তিন জন পাথরের পাত খসিযে অস্ত্র তৈরী করছে। এক জনে লম্বা গাছের ডালে তা বেঁধে তৈরী করছে বর্শা। বর্শা তৈরী করে তাক করে পরখ করছে তা'র গুণ।

হাওয়া কেঁপে ওঠে যেন কার তীক্ষ্ণ আর্তনাদে। থর থর করে যেন কেঁপে ওঠে গুহা। ভয় পেয়ে যেন গুহা মুখের আগুন লাফিয়ে ওঠে আরো ওপরে। অমনি উল্লাসে ফেটে পড়ে গুহার সবাই। দীর্ঘ দিন খেটে তা'রা পাহাড়ের নিচে তৈরী করেছে এক বড গর্ত্ত। তা'র ভিতর নিপুণ হাতে বসিয়ে রেখেছে অনেকগুলো তীক্ষ্ণ বর্শা। তারপর সেই গর্ত্তের মুখ ঢেকে দিয়েছে গাছের লতাপাতা দিয়ে।

আর চলতে চলতে একটা ম্যামথ পড়েছে সেই গুহায় হুমড়ি খেয়ে। ধারালো বর্শাগুলো গেঁথে গেছে পব পর। যন্ত্রণায় চীৎকার করছে। কাঁপছে হাওয়া। কাঁপছে মাটি। ছট্‌ফট্ করছে সে মৃত্যু-ফাঁদ থেকে বেরিয়ে যাবার জন্য।

সারারাত সে এমনি চিৎকার করবে। তার তীক্ষ্ণ তীব্র আর্তনাদে পশুর দল ভয় পেয়ে ছুটে পালাবে দূর থেকে দূরে। আতঙ্কে স্থির হয়ে থাকবে গাছের পাতা। গুহার মানুষগুলো আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করবে ভোরের জন্য।

এক সময় ভোর হবে। সূর্য উঠবে। নরম রোদ ছড়িয়ে পড়বে সবুজ পাতায়। বরফের আলোর প্রতিবিম্ব। তখন সবাই বর্শা, কুঠার নিয়ে যাবে নিচে। ফাঁদে পড়া আহত পশুর গায়ে আঘাতের

পর আঘাত করবে। মরিয়া হয়ে লড়াই করবার চেষ্টা করবে ম্যামথ। এক সময়ে নেতিয়ে পড়বে।

তারপর কুঠার দিয়ে কেটে কেটে টুকরো করবে মাংস পিণ্ড। গর্ত থেকে চাঁই চাঁই মাংস উঠবে উপরে। তারপর বয়ে আনবে গুহায়। দিনের পর দিন চলবে আহার।

ম্যামথটা যেন চীৎকার করছে দীপুর কানের কাছে। লাফিয়ে ওঠে দীপু। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। পর মুহূর্তে মনে পড়ে আদিম মানুষের স্বপ্ন দেখছিল সে।

কান্নাও উঠে পড়েছে। গুহার মুখেও আগুন প্রায় নিভে এসেছে। ধোঁয়া পাক খেয়ে উঠছে উপরে। কোথা থেকে যেন আওয়াজ আসছে তেমনি। কে যেন কার গলা টিপে ধরেছে। আর সে প্রাণপনে চিৎকার করছে বাঁচার তাড়নায়।

দীপু পায়ে পায়ে গুহার ভিতরে চলে যায়। কান্নাও এগিয়ে আসে পায়ে পায়ে। সঙ্কীর্ণ একটা কোণে বসে পড়ে। ভয়ে বোধহয় তাদের কাঁপুনি আসে!

আবার সব চুপ চাপ। বাইরে অন্ধকার। পাহাড়ের মাথাগুলো যেন জমাট বাঁধা অন্ধকার। আগুন নিভে গেছে। গুহাটা যেন নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে মুখ ডুবিয়ে দিয়েছে। পাশে বসে থাকা কান্নাকেও দেখা যায় না শুধু নিঃশ্বাসে তা'র উপস্থিতি বোঝা যায়। দু'জনে চুপ চাপ বসে থাকতে থাকতে আবার চোখ জড়িয়ে আসে। ঠাণ্ডা হাওয়া আসছে। ঝিমিয়ে পড়ে দু'জনেই

ঘুম ভাঙতেই দু'জনে উঠে পড়ে। গুহার বাইরে আসে। কড়া রোদ উঠেছে। পাহাড়ের মাথায় মাথয় রোদের ঝলকানি। অন্য সময় হলে এমন দৃশ্য দেখে হতো মুগ্ধ। হয়তো তাকিয়ে থাকতো দু'জনে। এখন মনের এমন কোন অবস্থা নেই। খিদেয় পেটের ভিতর মোচড় দিচ্ছে। কান ঝাঁ ঝাঁ করছে।

আবার যাত্রা করতে হবে কোন একটা গ্রামের আশায়। পাথর ভেঙে চলতে হবে। চলা আর চলা। দীপুর আসল উদ্দেশ্য

অর্থহীন হয়ে যাচ্ছে। এই শুশুনিয়ায় আসতে কম কষ্ট করতে হয়নি তা'র। আশা ছিল, উদ্যম ছিল, ছিল বুকে প্রাচীন মানুষ অবিষ্কারের স্বপ্ন।

সে স্বপ্ন দেখেছে আবিষ্কার করবে শুশুনিয়ার পাহাড়ে আদি-প্রস্তর-যুগের আদিম মানুষ। তারপর তা'র আর কিছু করার নেই। পণ্ডিতজনেরা এগিয়ে আসবেন। দিনের পর দিন অনুসন্ধান করবেন। গবেষণা হবে। নতুন নতুন তথ্য প্রকাশিত হবে। প্রমাণিত হবে শুশুনিয়ার মানুষ ধাপে ধাপে এগিয়ে তৈরী করেছে পাণ্ডুরাজার ঢিবির সভ্যতা। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে পাত্রের গায়ে পাওয়া গেছে ধানের ছাপ। ধান আবিষ্কারের গৌরব তা হ'লে পাণ্ডুরাজার ঢিবির মানুষের প্রাপ্য।

ধান আবিষ্কার সে তো নব-প্রস্তর যুগের প্রারম্ভের কথা। সে ইতিহাস আছে বাংলার মাটিতে। পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে পাওয়া গেছে ঘষে পালিশ করা প্রস্তর কুঠার। তা'র সঙ্গে তামার অস্ত্র।

এই মানুষগুলির আদি ইতিহাস কোথায়? এরা কি বিরাট পৃথিবীর অন্য কোন অঞ্চলের আগন্তুক মাত্র! এ প্রশ্নের জবাব আছে শুশুনিয়ায়।

কিন্তু কিছুই করতে পারলো না দীপু। এখন বাঁচার কথাই বড় হয়ে উঠেছে তা'র কাছে। কাছাকাছি কোন গ্রাম খুঁজে পাওয়ার জন্য পাগলের মত খুঁজে মরছে।

কালকেই অনেকগুলো পাথর সংগ্রহ করেছে তা'রা। সব জমা আছে গুহার মুখে। সে গুলো টেনে তুলে ছিল আদিম মানুষের মত ব্যবহার করবে বলে। কিন্তু কোন প্রয়োজনে লাগেনি তাদের। এখন গুহা ছেড়ে চলে যাবে তা'রা।

গুহাটা দিনের আলোয় ভাল করে দেখে নিতে চায় দীপু। আদিম মানুষের প্রমাণ কিছু পেতেও পারে। প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা আছে। বিনা আয়াসে অবিষ্কার হয়েছে যুগান্তকারী তত্ত্ব। যে আবিষ্কার করেছে সে বিন্দুমাত্র জানতো না তা'র মূল্য!

দিনের পর দিন হাওয়া ঢুকেছে গুহায়। ফাটল বেয়ে জল নামে। বড় পরিষ্কার গুহাটা। দীপু বাইরে আসে। তাদের জমানো পাথরের টুকরো। একটা পাথর যেন কেমন লাগছে। লম্বাটে গড়ন পাশ গুলো যেন ঠুকে ঠুকে সরু করার চেষ্টা হয়েছে। দীপু ঝুঁকে পাথরটা তুলে নেয় হাতে। হ্যাঁ, তেমনই তো মনে হচ্ছে তা'র। মনে হয় যেন আনাড়ি হাতে অস্ত্রে পরিণত করতে চেয়েছে কেউ।

দীপু ভুল করতে পারে। এসব বুঝতে হলে অনেক অভিজ্ঞতা থাকা চাই। দীপুর তো সে সব নেই। তবুও পাথরের টুকরোটা ফেলে দেয় না দীপু। রুমালে বেঁধে কোমরে ঝুলিয়ে নেয়। কে জানে এটিই হয়তো একটি মূল্যবান সম্পদ। আগে একটা গ্রাম খুঁজে বের করে কিছু খেয়ে নেবে। সুস্থ হয়ে ভাল করে পরীক্ষা করবে। দরকার বোধ না করলে ছুঁড়ে ফেলবে দূরে।

বুড়ো পাহাড় মূক বধির হয়ে আছে। দীপু তাকিয়ে থাকে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন ঘোর লাগে। কিছুই পাবে না এ হ'তেই পারেনা। রিক্ত হাতে ফিরে যাবে? এত সহজেই হার মানবে দীপু!

চারিদিক বড় প্রাচীন বড় বেশী পুরনোর ছাপ। অবহেলায় যেন পড়ে আছে পিতৃপুরুষের ব্যবহার করা সামগ্রী। হুট করে চলে যেতে মন মানে না দীপুর। জায়গাটায় যেন কেমন পুরনো গন্ধ। দীপুর বুকের উপর সে গন্ধ যেন চেপে বসে আছে। যেন বুকের ভিতর কথা বলছে। বলছে, চোখ খোল দীপু, এখানেই পেতে পারো মূল্যবান কোন সম্পদ।

অনেক পঠিত জ্ঞান যেন দীপুকে সক্রিয় করতে চায়। প্রাচীন মানুষের পরিচয় এখানেই পাওয়া যাবে যেন বার বার মন বলে। দীপু ঘুরে দাঁড়ায়। গুহার ভিতরে ঢোকে। হ্যাঁ, তার বিশ্বাস যেন বাড়ে। এমন একটা সুন্দর জায়গায় সে যুগের মানুষ ব্যবহার করেনি হ'তেই পারে না।

গুহাটা পুরনো। দেওয়ালে দেওয়ালে ফাটল। জীর্ণ হয়ে গেছে। ভূমিকম্পের একটু নাড়া পেলেই ধসে যাবে। হুড়মুড় করে উপরের

পাথর খসে পড়বে। চিরকালের মত হারিয়ে যাবে গুহাটা।

দীপু মেঝে পাতি পাতি করে খোঁজে। ধূলো বালি সাবধানে সরিয়ে দেখে। ফাটলগুলো লক্ষ্য করে। সে বেশি কিছু আশা করে না। ছ'একটি হাড়ের টুকরো যদি পায় তাতেই খুশী হবে দীপু। সেটাও কম পাওয়া নয়। দীপুর মনে পরে জার্মানির জুরা পাহাড়ের কথা। জুরা পাহাড়ের একটি গুহায় ভল্লুকের হাড়ের সঙ্গে পাওয়া গেছে অতি প্রাচীন মানুষের হাড়। কার কে খাদ্য হয়েছিল তা আজ আর জানাব কোন উপায় নেই। কিন্তু ইতিহাসের বড় একটা প্রমাণ পড়েছিল সেখানে।

কান্না দীপুকে ডাকে। এমনি পাগলামি করে সময় নষ্ট করা পছন্দ হয় না তা'র।

দীপু বলে, দাঁড়া, একটু ভাল করে খুঁজে দেখি।

দীপু হতাশ হয়। তা'র থেকে বেশী হয় রাগ। সে নিজেকেই নিজে গালি দেয়। ছিঃ ছিঃ কি নির্বোধের মত কাজ করছে সে! এই গুহার নিচটা খুড়ে দেখা দরকাব। তবেই-না সে পাবে যে প্রমাণ খুঁজছে তাই।

সব কি আর মাটির উপর পড়ে থাকবে! মাটি খুঁড়ে তবেই পাওয়া যায় প্রত্নতত্ত্বের বড় বড় প্রমাণ। সেদিনের ব্যবহার করা জিনিষের উপর দিনের পর দিন কত ধূলোমাটি জমেছে। এমনি করে ধাপে ধাপে তা'রা নিচে চলে যায়। চলে যায় মাটির জঠরে। মাটি তখন মা হয়ে যায়। মা হয়ে এসব পুরণো সম্পদ রক্ষা করেন।

দিনের পর দিন আবহাওয়ার পরিবর্তনে মাটি-পাথরের পরিবর্তন হয়। যেখানটা ছিল উষর ধূ ধূ বালি তার বুকের উপর দিয়ে নদী বয়ে যায়। ছ'পার হয়ে ওঠে শস্যশ্যামল। অন্য দিকে শস্যশ্যামল প্রান্তর মরুভূমি হয়ে যায়। সমুদ্রের বুকে পাহাড় দৈত্যের মত মাথা জায়গায়। আকাশ ছোঁয়া পাহাড় মাটির নিচে তলিয়ে যায়। এমনি কত পরিবর্তনই না ঘটে গেছে পৃথিবীর উপর দিয়ে।

শিলাস্তর বিন্যাস ক'রে তা'র জঠরে পাওয়া ফসিলের বয়স নির্ণয়

করতে হয়। এ করতে হ'লে ধাপে ধাপে মাটি পাথর কেটে নিচে নামতে হয়। তবেই পাওয়া যেতে পারে বড় বড় খোঁজ খবর। কিন্তু দীপু কি করবে। খোড়ার মত যন্ত্রপাতি নেই তা'র। নেই তা'র হাতে কলমে শিক্ষা।

এ গুহাটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করে না দীপুর। এখানেই আছে। কিন্তু দীপু খুঁজতে পারছে না। হাতের কাছেই আছে। একটু আবরণ সরিয়ে ফেলতে পারলেই উঠে দাঁড়াবে সে যুগের মানুষ। একটা দাঁত, অথবা এক টুকরো হাড়, অথবা একটি পাথুরে অস্ত্র তুলে দেবে দীপুর হাতে।

কিন্তু আর অপেক্ষা নয়। তাকে যেতেই হবে। শুধু শুধু বসে থেকে কোন লাভ নেই। কান্না চঞ্চল হয়ে পড়েছে। কান্না জানে নিরস্ত্র মানুষ এখানে কি অসহায়।

দু'জনেই নিচে নামে। নদীর মত নাবালো পথ ধরে চলতে শুরু করে। দু'পাশে ক্ষয়ে যাওয়া পাথরের চাঁই, যেন মরচে পরা সব লোহার পাথর। তেমনি লাল রং। কোথাও কোথাও পাথর গুঁড়ো হয়ে গেছে যেন শুরকির পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। তেমনি গুঁড়োগুলো লাল। পা দিলে ধ্বসে যায়। মাঝে মাঝে গর্ত। হয়তো ইঁদুর ওসব গর্তে থাকে।

তাদের আশে পাশে ছোট ছোট ঝোপ ঝাড়। ঢেউ খেলানো মাটি। কে জানে কতদিন ধরে ঝড় বৃষ্টিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে এমন ছন্নছাড়া চেহারা হয়েছে।

দীপু ঠিক করে তা'রা চলবে সূর্যকে লক্ষ্য করে। যেমন তেমন ভাবে চলতে থাকলে আঁকা বাঁকা চলা হবে। তাতে করে হয়তো একটা নির্দিষ্ট এলাকাতেই ঘুরতে থাকবে। তা থেকে একটা দিক ঠিক করে নিয়ে চলতে হবে। হয়তো শেষ পর্যন্ত লোকালয় পেয়ে যাবে।

কিন্তু এই পরিত্যক্ত পাহাড়ে চলা অত সহজ নয়। সারা পথে তীক্ষ্ণ ধারালো কাঁকর ছড়ানো। শুধু পায়ে কান্নাতো চলতেই পারছে না। ছোট ছোট নুড়ি হুড়মুড় করে গড়িয়ে পড়ে। নরম জায়গায় পা

পড়লে পাথর গুড়িয়ে যায়। পা ফসকে যেতে চায়।

হ'লও শেষটায় তাই। কান্নার পায়ের খ'নিকটা চামড়া ছিঁড়ে যায়। অগত্যা ওদের সে পথ পরিত্যাগ করতে হ'ল। ওরা খাদ ছেড়ে উপরে ওঠে।

ক্রমশঃ বেলা বাড়ে। কিছু একটা খাওয়া দরকার। ক্লান্তিতে আর পা চলে না। চোখের সামনে যেন সব অন্ধকার মনে হয়। পা টলে, মাথা ঘোরে। পড়ে যাবে নাকি দীপু?

দীপু বসে পড়ে। দেহের ভার যেন আর বইতে পারে না সে। চারিদিকে ছোট ছোট গাছ। ঝোপ ঝাড় বুনো লতা। কোন গাছে এমন একটা ফল নেই যে ছিঁড়ে খাবে। তবে কি এখানেই না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে।

দীপু বলে, যা খিদে পেয়েছে নিজের আঙ্গুল কামড়ে খেতে ইচ্ছে করছে।

কান্না হাসে। সে এক বিচিত্র হাসি। সে হাসির ভিতর থেকে যেন কান্নাই ঝরে পড়ছে।

পাখী মারবো? কান্না তা'র তীর ধনুক নিয়ে দাঁড়ায়।

কিন্তু কেথায় পাখী! জীবজগৎ যেন এই পাহাড়কে পরিত্যাগ করেছে। এখানকার মাটিতে বোধহয় বিষবাষ্প আছে। সেই বিষ হাওয়ায় হাওয়ায় ঘুরে বেড়ায়। জীবজন্তুর দল ভয়ে পা দেয় না এদিকে।

দীপুদের অবাক করতে যেন ঠিক সেই সময় একটা পাখী উড়ে এসে বসে একটা শুকনো গাছে। গাছটা কত দিন আগে যেন মরে গেছে। শুকিয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাখীটা তা'র ডালে বসে। বসে নিচের দিকে মুখ করে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওদের দেখে, দেখে অবাক হয়। একবার আকাশে উড়ে যায় আবার এসে বসে ডালে। ছু'জন আগন্তুককে দেখে।

কান্না ধনুকে তীর জোরে। কিন্তু তীর ছোঁড়ার আগেই পাখীটা উড়ে যায়। কান্না পিছু পিছু ছুটে যায়।

কান্না মিলিয়ে যায় পাথরের আড়ালে। দীপুর আর সহ্য হয় না। চোখ ঝাপসা হয়ে ওঠে। কান্না পায় দীপুর। ইচ্ছা হয় পাথরের উপর গড়িয়ে পড়ে। মাকে ডাকে, মা-মাগো—

দু'জনে আবার চলে। দু'পাশে একই রকম লাল পাথর। মুড় মুড় করে লাল পাথর গুঁড়িয়ে যায় পায়ের চাপে। মরা সাপের খোলস। দুমড়ানো শুকনো পাতা। পাখীর পরিত্যক্ত পালক— আর কিছুই চোখে পড়ে না ওদের।

খানিকটা এসে ওরা জলের সন্ধান পায়। তখন দুপুর। সূর্য মাঝ আকাশে। রোদে ঝলসে যাচ্ছে যেন দূরের দৃশ্য। পায়ের নিচে গরম পাথর।

পাহাড়ের খাদে খানিকটা জল জমে আছে। দু'জনে ছুটে গিয়ে দু'আঁজল ভ'রে জল পান করে। চোখে মুখে জল দেয়। দীপু মাথাটাও ভিজিয়ে নেয়। আঃ, কি ঠাণ্ডা। বড় আরাম লাগে তা'র। ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে শরীর।

কান্না বলে, হেথায় বইসব পাখী আসবেক।

দীপুর খারাপ লাগে না প্রস্তাবটি। কাছাকাছি কোথাও জল পড়েনি চোখে। এখানে যে সব জীবজন্তু আছে তাদের এখানেই আসতে হয় জল পান করতে। বড় বড় গাছ এবং জঙ্গল নেই। বড় হিংস্র কোন জানোয়ার না থাকাই স্বাভাবিক।

ওখানটায় ওত পেতে বসে থাকাই ঠিক করে ওরা। কোন জানোয়ার জল খেতে এলেই কান্না তীর ছুঁড়বে। পরে তাকে ঝলসে মাংস খাবে। নয়তো না খেয়েই মরতে হবে দু'জনকে।

দীপুর মনে পড়ে যায় সিনেমায় দেখা একটি দৃশ্য। বাবার সঙ্গে আফ্রিকার গভীর বনে তোলা এক শিকারের ছবি দেখেছিল। শিকারীরা কেমন করে ঝলসে মাংস খায় তা দেখেছে দীপু।

সে ঠিক অমনি করে ঝলসে নিতে পারবে। তারপর দু'জনে পেট পুরে মাংস খাবে। হাতের কাছে জলতো আছেই। তারপর যদি একটু ঘুমিয়ে নিতে পারে আবার চাঙ্গা হয়ে উঠবে। সহজেই

অনেক পথ হাঁটতে পারবে।

দু'জনে একটা পাথরের আড়ালে বসে থাকে। দীপু ভাবে আর আশ্চর্য হয়। আশ্চর্য না হ'য়ে কি পারা যায়! সেওতো বিপাকে পড়ে আদিম মানুষের মত আদিম কায়দায় শিকার করতে বসেছে। এমনি করেই তো আদিম মানুষ ঝরনায় অথবা নদীর পারে লুকিয়ে থাকতো দল বেঁধে। যেই কোন জানোয়ার জল খেতে আসতো অমনি পাথুরে অস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তো।

কট্‌ ··কট্‌···কট্‌ আওয়াজ শুনে চমকে ওঠে দু'জনে। জলাটার ওপাশের জঙ্গলের ভিতর থেকে একটা মোড়গ বেড়িয়ে অসেছে। একেবারে বাচ্ছা। হয়তো কয়েকদিন হলো উড়তে শিখেছে। ফুরুৎ করে উড়ে গিয়ে উঁচু একটা পাথরের উপর বসে ঘাড় লম্বা করে কি যেন দেখে। আবার নেমে আসে নিচে। কান্না তা'র ধনুকে তীর জোরে। এক চোখ বন্ধ করে লক্ষ্য স্থির করে।

হঠাৎ হাঁটতে শুরু করে বনমোরগ। ডানে বাঁয়ে মাথা ঘুরিয়ে দুপাশ দেখতে দেখতে সামনের দিকে এগোতে থাকে। একটু এগিয়েই থমকে দাঁড়ায়। টের পেল নাকি? দীপুদের দিকেই তাকিয়ে আছে ওরা নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা করে।

কিন্তু ওদের দেখতে পায়নি বন মোরগটা। নিজেকে সে খুব নিরাপদ মনে করে বোধ হয়। আবার পায়ে পায়ে এগোয় দীপুদের দিকে। নিষ্পলকে তাকিয়ে থাকে দু'জন।

হঠাৎ কোঁ-কোঁ-কোঁ করে চীৎকার করে উপরে লাফিয়ে উঠে মোরগটা। তার পরে মুখ থুবড়ে পড়ে।

মার দিয়া, চিৎকার করে উঠে কান্না। ছুটে গিয়ে মোরগটাকে ধরে ফেলে।

নিপুণ হাতে মোরগের ছাল ছাড়ায় কান্না। খুব অসুবিধা হয় না তা'র। জন্ম থেকে সে কত মোরগের ছাল ছাড়াতে দেখেছে। অবশ্য ছুরির বদলে তীর দিয়ে ছাড়াতে খানিকটা অসুবিধা হয়। তাতে তো আর কাজ আটকে থাকে না। আগুন জ্বালায়। লতায় ঠ্যাং বেঁধে

আগুনের উপর ঝুলিয়ে দেয় মোরগটাকে। অপেক্ষা করে মাংস ঝলসে যাওয়ার। কিন্তু মন মানে না। সময় যেন দীর্ঘ মনে হয়। আগুনের তেমন তেজ নেই। মাংস যেন সিদ্ধ হয়না কিছুতেই। কত সময় লাগে একটা মোরগ ঝলসাতে!

তারপর দু'জনে বসে যায় আহারে। হাতের আঁজলায় জল তুলে পাথর ধুয়ে পরিষ্কার করে দীপু। সেখানেই মোরগটাকে শুইয়ে দেয় তা'রা। তীরের ফলা দিয়ে টুকরো টুকরো করে। এক এক টুকরো মুখে দেয়। কয়েকবার চিবিয়ে গক্ করে গিলে ফেলে। নুন লঙ্কার কথা মনেই আসেনা ওদের। পেট পুরে মাংস খায়।

হঠাৎ দীপুর খেয়াল হয়, লাইটারে আর তেল নেই। তার ফলে আর আগুন জ্বালাতে পারবে না তা'রা। দু'চার দিনের মধ্যে ওরা কোন গ্রাম খুঁজে পাবে তার নিশ্চয়তা নেই। হয়তো এমনি মোরগ শিকার করে বাঁচতে হবে। কিন্তু কাঁচা মাংসতো আর খেতে পারবে না। মাংস আগুনে ঝলসে খেতে শিখেছে মানুষ তিন লক্ষ বছরেরও আগে। দীর্ঘ দিন বংশপরম্পরায় মানুষ মাংস ঝলসে খেয়েছে। রান্না করে খেতে শিখেছে নব প্রস্তর যুগে। এত দিনের অভ্যাস পরিত্যাগ করতে পারে মানুষ এক লহমায়!

তাই ভবিষ্যতের জন্য আগুন বাঁচিয়ে রাখতে হবে। মোটা একটা কাঠের গুঁড়ি ওরা জ্বালিয়ে নেয়। এখন এই আগুন সঙ্গে নিয়ে চলতে হবে। যদি দিনের পর দিন এমনি চলতে হয় তবুও বাঁচিয়ে রাখতে হবে আগুন। এ আগুন নিবে গেলে খাদ্য পেলেও খাওয়া হবে না। কাঁচা মাংস খেয়ে হজম করতে পারবে না। অতীতের হজম শক্তি আর নেই মানুষের। পরিবর্তন হয়েছে দাঁতের। হাজার হাজার বছর সিদ্ধ খেয়ে পরিবর্তন হয়েছে পরিপাক যন্ত্রের।

রাত্রে হয়তো কোন গুহায় আশ্রয় নিতে হবে আবার। বাঁচতে হ'লে আগুন জ্বালিয়ে রাখতে হবে গুহা মুখে। নয়তো হিংস্র জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করা যাবে না।

আবার দু'জনে চলতে থাকে। দ্রুত পা চালায়। সূর্যাস্ত হবার আগেই একটা নিরাপদ জায়গা খুঁজে নিতে হবে। কিন্তু ওরা আর কোন গুহা খুঁজে পায় না বরং ক্রমশই উপত্যকার দিকে নামতে থাকে। পাহাড়গুলো যেন মাটির ঢিপির মত ছোট। এখানে ওখানে জল গড়িয়ে যাবার খাদ। নুড়ির পাহাড়। মাঝে মাঝে দু'একটা বড় গাছ। সাদা স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পাথর। কোথাওবা পাথর গেরুয়া মাটির নিচ থেকে মাথা তুলে আছে। কালো রং। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন মোষ দাঁড়িয়ে আছে।

দেখতে দেখতে সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ে। ওদের সামনে লম্বা ছায়া। ক্লান্ত অবসন্ন দেহ টেনে টেনে চলেছে দু'জন। কোথায় তা'রা যাবে তা জানেনা। সামনে কি আছে তাও অজানা। ওরা শুধু জানে ওদের চলতে হবে।

ওরা চলেছে চওড়া একটা খাদ দিয়ে। হয়ত এককালে এই পথে পাহাড়ের জল দ্রুত বেগে নেমেছে সমতলভূমিতে। পাথরে বাধা পেয়ে জল তুলেছে ঘূর্নি। পাথরে পাথরে আঘাত করেছে বিপুল বেগে। জল আবর্তিত হয়েছে প্রচণ্ড রোষে। তারপর যেন কত যুগ ধ'রে এপথে জল যায়নি। হয়তো বর্ষার হাঁটু জল তর তর করে বয়ে যায়। তারপর সে জল সূর্যের নিষ্করুণ তেজে শুকিয়ে বাষ্প হয়ে মিলিয়ে যায়। পড়ে থাকে নুড়িব পাহাড়।

চলতে চলতে কান্না বলে, তু হেবাটে ক্যানে এলি ?

কেন এলাম ? কান্নার মুখে একবার চোখ বুলিয়ে নেয় দীপু। বড় করুণ হাসি হাসে। বলে, যা খুঁজতে এসেছিলাম তা আর খোঁজা হ'ল কই।

কি খুঁজতে এলি বটে ? কান্না আবার জিজ্ঞাসা করে।

আদিম মানুষের পরিচয়। লক্ষ লক্ষ বছর আগে আমরা এখানেই ছিলাম। সেই থাকার প্রমাণ আবিষ্কার করতে হবে।

কান্না কিছুই বুঝতে পারে না। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে।

বুঝতে পারলিনে আমি জানি, দীপু মাথা ঝাঁকিয়ে বলে। তোকে

বোঝাতে পারবো তা আমার মনে হয় না। তবুও বলছি।

কান্না উৎসুক দৃষ্টিতে তাকায়।

মানুষের জন্ম আর তা'র সভ্যতা সৃষ্টির উষালগ্নের অনেক খবর আবিষ্কার করেছেন পণ্ডিতজনেরা। ইউরোপ, আফ্রিকা, এশিয়ার নানা জায়গায় তা'র প্রমান পাওয়া গেছে। কিন্তু বাংলায় তেমন কিছু পাওয়া যায় নি। কিন্তু বাংলার কোন কোন অঞ্চল খুব প্রাচীন। পৃথিবীর সব থেকে উঁচু পাহাড় হিমালয় ছিল সমুদ্র গর্ভে। পণ্ডিতরা নাম দিয়েছেন 'টেথিস্' সাগর।

মানুষের বাঁচার লড়াইএর উপাদান, একটু বাড়িয়ে বলা যায় মানব সংস্কৃতি, তা'র জন্ম 'প্লাইস্টোসীন' যুগের শেষের দিকে। এ যুগেই মানুষ প্রথম পাথরকে অস্ত্র রূপে ব্যবহার করতে শুরু করে। আমার বিশ্বাস এই শুশুনিয়ায় সেই যুগেই মানব সংস্কৃতির সূত্রপাত হয়েছিল। ভারতের আদিবাসীরা এখান থেকেই ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে এগিয়েছে। কিন্তু তা'র প্রমাণ কই। অনুমানের কোন মূল্য নেই। চাই পাথুরে প্রমাণ। ভেবেছিলাম এখানে তা পাব।

কান্না কান পেতে শোনে সব। কিন্তু কিছু বুঝতে পারে ব'লে মনে হয় না। নিষ্পলকে তাকিয়ে থাকে।

সূর্য নেমে যায় পশ্চিম দিগন্তে। মরা রোদ পাথরে পাথরে। ঝির ঝির করে হাওয়া বইছে। ওদের ছায়া প্রায় মিলিয়ে যাচ্ছে। এক ঝাঁক পাখী ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে যায়। সামনে যত দূর দৃষ্টি যায় শুধু নুড়ির স্তূপ। তারা যেন অন্ধকারে জড়িয়ে যাচ্ছে। রাত্রি আসছে। আর একটি ভয়ঙ্কর রাত্রি আসছে কান্না ও দীপুর সামনে।

কোন গুহার সন্ধান পেল না ওরা। কোথায় রাত কাটাবে? ওদের তা নিয়ে বেশি ভাবনা নেই। কিছু ভাববার মত মনের অবস্থাও নেই। ওরা বুঝতে পারে এবার ওদের থামতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি একটা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে নিতে হবে।

খাড়া পাহাড়ের একটা খাদ ওরা বেছে নেয় রাতের মত থাকার

জন্য। খাদটা বেশ গভীর। অতীতে জলের স্রোত এখানে বাধা পেয়ে পাক খেয়েছে। পাথর ক্ষয়ে তখন সৃষ্টি হয়েছে এই খাদ। তিন দিক ঢাকা। উপর আর সামনের দিক খোলা। কিছু আগুন জ্বেলে রাখলে এখানে নিরাপদে রাত কাটলেও কাটতে পারে।

শুকনো পাতা আর কাঠ সংগ্রহের চেষ্টা করে। কিন্তু তা'র আগেই অন্ধকার নেমে আসে। ওরা শূন্য হাতে ফিরে আসে খাদে। সারা রাত জেগে বসে থাকতে হবে দু'জনকে। অন্য কোন পথ নেই সামনে। দু'জনে কাছাকাছি বসে। ক্লান্ত শ্রান্ত অবসন্ন দেহ। বসতে বসতে দু'জনের চোখে ঘুম নেমে আসে। পাশাপাশি শুয়ে পড়ে।

বাইরে গভীর রাত। অন্ধকার যেন চেপে বসে। শুরু হয় পাহাড়ের কোলে বয়ে চলা যুগ-যুগান্তরের আদিম জীবনযাত্রা। একে একে অন্ধ বিবর থেকে বেরিয়ে আসে সরীসৃপের দল। অন্ধকারে তা'রা সতর্ক পায়ে চলে খাদ্যের অন্বেষণে। সে এক বিচিত্র নাটক।

কে কখন কার শিকার হয়ে যাবে কেউ জানে না। যে শিকারী শিকার দেখে ওত পেতে বসে আছে তা'র পিছনেই হয়তো বসে আছে তা'র থেকেও শক্তিমান শিকারী। মুহূর্তে একের ওপরে অপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আহত পশু মরণ আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে ছট্‌ফট্‌ করে। তারপর নেতিয়ে পড়ে। রক্তের ধারা ব'য়ে যায় নির্বিকার পাথরের বুক বেয়ে।

কত যুগ-যুগান্তর ধ'রে এখানে চলেছে এই প্রাণঘাতী নাটক। চিরকাল নির্বিকার থেকে দেখে গেছে শুশুনিয়া পাহাড়। দিনের পর দিন কেটে গেছে। তা'র যৌবন ধীরে ধীরে হারিয়ে গেছে। আজ সে বার্ধক্যের শেষ প্রান্তে। তা'র পাঁজরে ধরেছে ঘুণ। পচে গেছে দেহ। গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে বুকের খাঁচা। তবুও সে দাঁড়িয়ে আছে আজও অতীতের সাক্ষী, পাষাণের দলিল হয়ে।

দলিল বৈকি। পাথরের ভাঁজে ভাঁজে আছে পৃথিবীর নানা যুগের নানা রকম ইতিহাসের চিহ্ন। সেগুলো দুর্বোধ্য পাষাণের ভাষায় লেখা আছে। সাজিয়ে রাখা আছে আরম্ভ থেকে আজকের পর্যন্ত

ইতিহাস। পরপর সাজিয়ে রাখা। সে দলিল পাঠ করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। সে দলিল পাঠ করতে হ'লে বিজ্ঞানের নানা শাখায় দখল চাই। তবেই না উদ্ধার হবে পাথরের দলিলে সঙ্কেতে লেখা ইতিহাস।

ওদের যখন ঘুম ভাঙে তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। ওরা সারা রাত ছিল গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন। জানতে পারেনি কেমন করে একটা কেউটে ওদের মাথার কাছ থেকে আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। লম্বা দেহ টেনে টেনে বাইরে বের করে এনেছে। বুকে ভর দিয়ে পাথরের পর পাথর ডিঙিয়ে গেছে খাদ্যের আশায়।

রাত শেষ না হ'তেই আবার ফিরে এসেছে। ভরা পেটে ধীরে ধীরে পাথর বেয়ে এসেছে খাদে। হয়তো তখন একবার মাথা তুলে অবাক হয়ে দেখেছে ওদের দু'জনকে। তারপর মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে ফাটলে। আস্তে আস্তে ভিতরে টেনে নিয়ে গেছে দীর্ঘ দেহ।

ওরা জানেনা কেমন করে প্রতিদিনের মত পুবের আকাশ পরিষ্কার হয়েছে। উঠেছে সূর্য। তা'র রক্তিম আলো ছড়িয়ে পড়েছে পাথরে পাথরে। সেই রক্তাভ আলো ক্রমশঃ হলুদ হয়েছে। সোনার মত জ্বলছে পাথর। মেঘের রাজ্যে ভেসেছে পাল উড়িয়ে সাদা মেঘের ভেলা।

ওরা জানেনা কতগুলো পাখী এসে বসেছিল ওদের কাছাকাছি। কিচির মিচির করে ডানা ঝাপটিয়ে। লম্বা ঠোঁট দিয়ে খুঁটে খুঁটে খেয়েছে নুড়ির ভিতর থেকে ওদের খাদ্য। তারপর এক সঙ্গে ঝাঁক বেঁধে উড়ে গেছে।

ওদের যখন ঘুম ভাঙে তখন দুপুর। কান্না দীপুকে তুলে দিতে গিয়ে চমকে ওঠে। দীপুর গা যেন আগুনের তাপে জ্বলে যাচ্ছে।

দীপু কোন রকমে চোখ খোলে। চোখে ঘোলাটে দৃষ্টি। তাকিয়ে থাকে কান্নার দিকে। যেন কোন কিছুর ছায়া পড়ছেনা ওর চোখে।

দীপুর চোখ লাল। মুখ ফোলা। তা থেকেও বেশি ফোলা

দীপুর পা। অবসন্ন দেহ। বিবর্ণ ঠোঁট। দীপু আবার নেতিয়ে পড়ে পাথরের ওপর।

ইস্, আঁতকে ওঠে কান্না। কেঁদে দেয়। বোঙ্গা ঠাকুর কি হোঁইচে। এটো বাঁচবেক লাই।

পাথরের মত দীপুর পাশে ব'সে রইলো কান্না। বুঝতে পারছেনা কি করবে। কিন্তু বসে থেকেও কোনো লাভ নেই। শহরের ছেলেটাকে নিয়ে যেতে হবে গ্রামে। নয়তো মরে যাবে।

আবার দীপুকে নাড়া দিয়ে ডাকে কান্না। দীপু চোখ খোলে। তেমনি বিহ্বল দৃষ্টি চোখে।

যাবিক নাই, কান্না বলে।

কোথায়? দীপু হাঁ করে থাকে। মা কোথায়? দীপু জিজ্ঞাসা করে। মা-মা বলে ডাকে। দীপু যেন নিজের ঘরেই বসে আছে। দীপুর মায়ের কানে সে ডাক গিয়ে পৌঁছলো কিনা কে জানে।

কি করবে এখন কান্না। কেমন করে দীপুকে নিয়ে যাবে? তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে আসে। এসেই ছুটতে থাকে। তা'কে খুঁজে নিতে হ'বে কোন লোকালয়। নিয়ে আসবে লোকজন। তা'রা ধরাধরি ক'রে নিয়ে যাবে দীপুকে।

কান্না পাগলের মত ছুটতে থাকে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নেই তা'র। সারা গা বেয়ে ঘাম ঝরছে। লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটছে। লাফিয়ে উঠছে পাথরের ওপর। আবার লাফিয়ে নামছে নিচে। কাঁকরে পড়ে পা পিছলে যেতে পারে তাও খেয়াল হয় না তা'র।

বাঁক ঘুরতেই সমুদ্র। জলের সমুদ্র নয় ঢেউ খেলানো প্রান্তর। যেন সমুদ্রের ঢেউগুলো কার মন্ত্রশক্তিতে স্থির হয়ে আছে। দুলছে না, কাঁপছে না। অনড় অচল হয়ে আছে যুগ যুগ ধরে। বালি, কাঁকর আর ক্ষয়িষ্ণু পাথর যুগ যুগ ধ'রে পরিবর্তিত হয়ে নিয়েছে এক বিচিত্র রূপ।

কান্না ঢেউ খেলানো প্রান্তর দিয়ে ছুটতে থাকে। দূর দিগন্তে সবুজের হাতছানি তা'র উপরে পরিষ্কার স্বচ্ছ নীল আকাশ।

ঢেউয়ের মাথায় উঠলে পরিষ্কার দেখা যায়।

আর ভয় নেই। ঐ সবুজ দিগন্তে আছে গ্রাম। কলা পাতার ছায়ায় ছোট ছোট ঘর। চালে পায়রা বসে আছে। দাওয়ার খাঁচায় ময়না পাখী। কুকুরটা কুণ্ডলী পাকিয়ে দিবানিদ্রার সুখে আচ্ছন্ন। উঠানে লাউডগার পাতা কাঁপছে। বউ-কথা-কও পাখী ডাকছে। পা ছড়িয়ে শিশু কোলে ব'সে আছে মা।

কান্না আকাশের পানে তাকায়। সূর্য মধ্য গগনে। এখনও অনেক বেলা আছে। কান্না পৌঁছে যাবে দিন থাকতে। গ্রাম থেকে লোক ধরে আনবে, নিয়ে যাবে দীপুকে।

আর বেশি দূব যেতে হ'লনা কান্নাকে। উপরে উঠতেই দেখতে পেল তাঁবু। তিন তিনটি তাঁবু পাতা আছে সমতলে। কয়েকজন লোক বসে আছে। তাদের সামনে বড় একখানা কাগজ পাতা। তা'রা আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে কি যেন আলাপ করছে। মাথায় শোলার টুপি, চোখে পুরু লেন্সের চশমা। পায়ে বুট জুতো।।

এমনি কত মানুষ দেখেছে কান্না কোলকাতা সহরে। রাস্তা দিয়ে সিগারেট খেতে খেতে যায়। কেউ বাসে উঠে বাহুরের মত ঝোলে! কেউ চলেছে গাড়ি ক'রে।

কয়েকটি লোক মাটি খুঁড়ছে। চৌবাচ্চার মত ক'রে কেটেছে পাহাড়ের উপত্যকা। মাঝে মাঝে দাগ কাটা। লোক গুলো ধীরে ধীরে খুন্তি চালাচ্ছে যেন কাজ করার কোন আগ্রহ নেই।

কান্নাকে দেখে তা'রাও কম অবাক হয়না।

দীপু যখন চোখ খোলে সূর্য তখন মধ্য আকাশে। সূর্য দপ্ দপ্ করে জ্বলছে। দীপু পাথর ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। পায়ের নিচে তা'র নিজের ছোট ছায়া। এই ছায়াটুকুই এখন তা'র একমাত্র সঙ্গী। তা'র পাশে আর কেউ নেই। বাবা মা কোলকাতায়। তা'রা এখন কি করছেন দীপু জানে না।

কান্নাকে খুঁজে পাচ্ছে না দীপু। কান্না কোথায় গেছে কে জানে। এই একক নির্জনতা পীড়িত করছে তা'কে। কি করবে কোথায় যাবে কিছু ঠিক করতে পারছে না। তা'র সামনে এখন রোদ। কিন্তু এর পরেই সূচনা হবে দিবাবসানের। নামবে রাত্রি। তা'র সামনে তা'র ভাগ্য কি রেখেছে জানে না দীপু।

পাথরের সংকীর্ণ ছায়ায় ব'সে পড়ে দীপু। এখানেই অপেক্ষা করবে কান্নার জন্য। কিন্তু কত সময় অপেক্ষা করবে? কান্না ভয় পেয়ে দীপুকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেল না তো! হয়তো ভেবেছে দীপু মরে গেছে। তাই হবে। নয়তো দীপুকে ফেলে পালিয়ে যাবার কথা ভাবতে পারতো না। তবে কি এই তা'র শেষ পরিণতি। দীপু কাঁদবে না হাসবে বুঝতে পারে না।

কিন্তু কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না দীপু। না, তা'কে ফেলে পালিয়ে যেতে পারে না কান্না। এই খাদটাকে কেন্দ্র করেই ঘুরতে হবে দীপুকে। কান্না যদি পথের সন্ধানে বেরিয়ে থাকে তাহ'লে নিঃসন্দেহ হ'তে পারবে সে। শুধু অনুমানের উপর নির্ভর ক'রে এই জনমানবহীন উপত্যকায় কান্নাকে ফেলে রেখে একা চলে যেতে পারবে না দীপু। যদি সারা জীবন খুঁজতে হয় তবে তাই খুঁজবে। চোরের মত নিজের প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে যাবে না।

কান্না নিজে আসেননি। শুশুনিয়া পাহাড়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের প্রমাণ আবিষ্কারের কোন আগ্রহ নেই তা'র। সে শুধু দীপুর জন্যই এরকম বিপদে পা দিয়েছে। আর তা'কে ফেলে রেখে চলে যাবে দীপু।

কিন্তু পা যেন চলে না দীপুর। মাথা সীসের মত ভারী। পেটের ভিতর পাক খাচ্ছে যন্ত্রণা। চোখ তা'র ঘোলাটে। সব কেমন ঝাপসা দেখায়। ভয়ানক পিপাসা। গলা শুকিয়ে কাঠ। এক পুকুর জল এক চুমুকে শেষ করে ফেলতে পারে সে।

খাড়াই পাথর ধরে টাল সামলায় দীপু। তা'র হাত লেগে ঝুরঝুর করে পাথর খ'সে পড়ে। ইস্, কিভাবে ক্ষয়ে গেছে পাথর। বয়স

তো কম হয়নি শুশুনিয়া পাহাড়ের। কত পাথর রূপান্তরিত হ'য়ে মাটিতে পরিণত হয়েছে। সে মাটিতে সবুজ ফসল ফলে এখন। দীপু যত ভাবে তত বিস্মিত হয়।

দীপু ক্ষয়ে যাওয়া পাথর দেখে। স্তরে স্তরে বালি, কাঁকড়, পাথর পর পর সাজানো। এ হ'ল এক এক যুগের ইতিহাস! পাথুরে দলিল, এ দলিলে সে যুগের ইতিহাস লেখা আছে। সে লিপি অন্য রকম। তা'র পাঠোদ্ধার একমাত্র ভূ-বিজ্ঞানীরাই করতে পারেন।

এ-কি, পাথরের টুকরোটা কোন জন্তুর চোয়ালের মত মনে হ'চ্ছে না! তবে এখানেই কি শিলীভূত হ'য়ে আছে অতীতের কোন জন্তুর পরিত্যক্ত চোয়াল!

দীপু তাড়াতাড়ি একটা ছুঁচলো পাথর তুলে নেয়। আস্তে আস্তে খোঁড়ে। একটু একটু করে কাঁকড় বালি সরায়। সাবধানে কাজ করে। কঙ্কালটা ভেঙ্গে না যায় পাথরে ঘা খেয়ে। কে বলতে পারে এটাই পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়ে যাওয়া কোন প্রাণীর চোয়ালের হাড় নয়! ভেঙ্গে গেলে সর্বনাশ। নষ্ট হবে দীপুর হাতেই প্রাগৈতিহাসিক শুশুনিয়ায় বেঁচে থাকা একটি লুপ্ত পশুর শিলীভূত প্রমাণ।

কখন সূর্য পশ্চিম আকাশের পথে পাড়ি জমিয়েছে খেয়াল করেনি দীপু। ভুলে গেছে কান্নার কথা। ভুলে গেছে যে সে সারাদিন কিছু খায়নি। মনেই পড়ছে না মাথার যন্ত্রণার কথা। খেয়াল নেই তা'র গা পুড়ে যাচ্ছে অসহ্য উত্তাপে।

বেরিয়ে এল পাথরের টুকরোটি। যত্নে বেরিয়ে এল নিখুঁত অবস্থায়, কয়েকটি বড় বড় দাঁতের শিলীভূত অস্তিত্ব। এ দাঁতগুলোই কি শুশুনিয়ার আদিম মানুষের অস্তিত্বের প্রমাণ? উল্লাসে চেঁচিয়ে ওঠে দীপু। কিন্তু চেঁচিয়ে ওঠা আর হয় না তা'র। মাথা ঘুরে গেল তা'র। পড়ে গেল পাথরের ওপর। দু'চোখে নেমে এল অন্ধকার। অজ্ঞান হয়ে যায় দীপু। সেই অচৈতন্য দেহ সন্ধ্যার সময় তুলে নিল কয়েকজন মানুষ। দীপু পড়ে ছিল একটা পাথরের খাঁজে। মাথায়

চোট লেগেছে। হাতের মুঠোয় ছিল এক টুকরো পাথর।

ঝুঁকে একজন হাত থেকে বের করে নিল পাথরের টুকরো। পাথরের টুকরো দেখে চমকে উঠলো সে। তাড়াতাড়ি ডাকলো সঙ্গের লোকদের। মিঃ সরকার দেখে যান—

মিঃ সরকার দেখে চমকে ওঠেন। এ যে লুপ্ত হয়ে যাওয়া সিংহের শিলীভূত দাঁত। আশ্চর্য, পাথর খুঁড়ে বের করেছে এই ছেলেটি! তা'রা যেন অবাক হতেও ভুলে যান।

কুলিরা কাঁধের ওপর তুলে নেয় দীপুর অচৈতন্য দেহ।

দীপুর জ্ঞান ফিরতেই সবার আগে তা'কে অভিনন্দন জানান অবনীবাবু। হাত বাড়িয়ে দীপুর হাত ধরেন। ঝাঁকানি দিয়ে বলেন, দীপু তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন জানাচ্ছি পশ্চিম বাংলার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পক্ষ থেকে। অতীতে এই শুশুনিয়ায় আদিম মানুষ তা'র বিবর্তনের অনেকগুলো ধাপ অতিক্রম করেছিল। তা'র প্রমাণ তুমি আবিষ্কার করেছো।

দীপু কোন কথাই বলতে পারলো না। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো অবনীবাবুর দিকে। এই মানুষটিকে এর আগে কখনো দেখেছে কিনা মনে করতে পারলো না। দীপু ক্যাম্প খাটে শুয়ে আছে তাঁবুর ভেতর। পাশে চেয়ার টেবিল। নানা রকম যন্ত্রপাতি।

খুব অবাক হয়েছো না? অবনীবাবু বললেন। আমাকে চিনতে পারছো না। ভাবছো এ কোথায় এলে! ছিলে পাহাড়ে আর এ হ'ল সরকারী ক্যাম্প। আমরা পশ্চিমবঙ্গের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের লোক। আমরাও এসেছি তোমার মত শুশুনিয়ায় আদিম মানুষের প্রমাণ খুঁজতে। কিন্তু তুমি তা'র প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবিষ্কার করেছ আমাদের মত। পাথুরে প্রমাণ। যে পাথরখানা কুড়িয়ে এনেছো ওটা একটা হাত কুঠার। প্রায় লক্ষ বছর আগে মানুষ তৈরী করেছিল। আর যে দাঁতটি পাথর খুঁড়ে বের করেছো তা আরও পুরণো। ও হ'ল প্রাগৈতিহাসিক যুগের সিংহের শিলীভূত দাঁত।

—সত্যি! বিস্ময়ে দীপুর চোখ বড় হয়ে ওঠে।

হ্যাঁ, দীপু এ সত্যি। সত্যি এই দুটি প্রমাণ সংগ্রহ করেছো। আমরা এখানে কয়েকদিন ধরেই খোঁড়া খুঁড়ি করছি। এখানে অনেক কিছু পেয়েছি। পেয়েছি বিলুপ্ত হাতীর বৃহদাকার চোয়াল, এছাড়া একাধিক প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর জীবাশ্ম। তুমি দুষ্প্রাপ্য সিংহের প্রমাণ বের করেছ। তোমাকে অভিনন্দন জানাবো না তো কাকে জানাবো।

সিগারেট ধরিয়ে নিলেন অবনীবাবু। বললেন, তোমার এ আবিষ্কারের খবর কোলকাতায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। হয়তো কালকের কাগজেই বের হবে। তোমার ডাইরী থেকে আমরা ঠিকানা নিয়েছি। তোমার বাবাকেও তার করা হয়েছে। বললেন, এখন ভাল লাগছে তো তোমার? খুব কাহিল হয়ে পড়েছিলে। তোমার সাথী কান্না এসে খবর দিয়েছিল তাই তোমার খবর পেলাম। গিয়ে দেখি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছ।

কান্না কোথায়? দীপু কান্নার খবর জানতে চায়। আহা কান্নাকে না পেয়ে কি কষ্ট হয়েছিল তা'র।

অবনীবাবু বসেন। বলেন, কান্না আছে। এখনই এসে পড়বে। সে আমাদের লোকজন নিয়ে গেছে পাহাড়ে। যে গুহায় তুমি হাত-কুঠারটা পেয়েছো সেটা দেখিয়ে দেবে। তারপর আরম্ভ হবে আমাদের অনুসন্ধান। দীপু তুমি কত বড় কাজ করেছো বুঝতে পারছো কি!

দীপু কোন কথা বললো না। শুধু হাসলো। সে হাসি বড় শীর্ণ দেখায়। এ ক'দিনে অনেক রোগা হয়েছে। গায়ের রং হয়েছে মলিন। জামা-কাপড় ছিঁড়ে গেছে। ভিখারীর মত চেহারা হয়েছে তার।

অবনীবাবু আবার বললেন, তুমি প্রমাণ করেছো শুশুনিয়ায় আদিম মানুষের উপস্থিতি। তখন শুশুনিয়ার আজকের ক্ষয়িষ্ণু রূপ ছিলনা। তুমি শুশুনিয়ার যে অনেক উপত্যকা দেখেছো এগুলোই ছিল এককালে মানুষের আবাস স্থল। প্যালিওলিথিক যুগে এসব জায়গা ছিল জীবজন্তুর পক্ষে অগম্য। তখন আবহাওয়া ছিল শুষ্ক। অনেক জল নালা পথে বয়ে যেত। সেই সব জলপ্রবাহের নিকট বসে আদিম শিল্পী তৈরী করতো তা'র শিকারের অস্ত্র।

তারপর আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে। ক্রমশঃ আর্দ্র হয়ে ওঠে শুশুনিয়া। শুরু হয় প্রবল বারিপাত। জলপ্রবাহগুলি ফুলে ফেঁপে ওঠে। ঘূর্ণির স্রোতে পাথর ধসিয়ে নিয়ে ছুটতে থাকে জল। চারদিকে শুশুনিয়ায় দেখেছো যে নুড়ির টাল এগুলো এভাবেই তৈরী। জায়গাটা হয়ে ওঠে পশুর আশ্রয় স্থল। শুশুনিয়ার মানুষ তেমনি পাথরের অস্ত্র তৈরী ক'রে চলে। ক্রমশ তা'দর কাজ হ'য় সূক্ষ্ম। অস্ত্র হয় ধারালো।

নদীর স্রোতে পাথর খসিয়ে নিয়ে যায়। বালি আর পলির স্তূপ জমে আর তা'র মাঝখানে আমরা খুঁজে পেয়েছি নানা রকম জীবজন্তুর প্রমাণ। নাম বলছি শোন। লুপ্ত লোমশ হাতি, এক জাতের শক্তিশালী মহিষের শৃঙ্গ। এরাও এককালে ছিল শুশুনিয়ার মানুষের পাশে। আর পেয়েছি আদিম মানুষের ব্যবহার করা নানারকম পাথুরে অস্ত্র। হরতনের আকারে হাত কুঠার, বর্শাফলক, ডিম্বাকৃতি হাতিয়ার, কর্ত্তরী প্রভৃতি।

কোথায় পেলেন এসব? কৌতুহলে দীপুর চোখ দুটি চক্ চক্ করে ওঠে। উত্তেজনায় উঠে বসে।

অবনীবাবু তা'কে শুইয়ে দেন। বলেন, দীপু এখুনি ওঠা চলবে না। তুমি এখনো সুস্থ নও। তোমাকে ভাল হ'তে হবে। আর পড়াশুনা করতে হবে। হাতে কলমে প্রত্নতত্ত্বের অনেক কাজ শিখতে হবে। তারপর বেরিয়ে পড়বে। তোমার সন্ধানী আলোতে আলোকিত হয়ে উঠবে অতীত ভারতের হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস।

দেখতে দেখতে বিকেল গড়িয়ে আসে। সূর্য নেমে যায় পাহাড়ের উপর—যেন সোনার মুকুট হয়ে জ্বলছে। তারপর টুপ ক'রে নেমে যাবে পাহাড়ের পিছনে। আকাশ লাল হয়ে যাবে। সেই রক্তাম্বরে ডানা কাঁপিয়ে ফিরবে পাখীর দল।

অবনীবাবু বলেন, দীপু তুমি শুয়ে থাক। আমি তোমার দুধ গরম করে আনছি।

আপনি? দীপু অবাক হয়। তা'র সামনে দাঁড়িয়ে প্রত্নতত্ত্বের

একজন বড় পণ্ডিত। আর তিনি কিনা দুধ গরম করে দেবেন! ছিঃ, কি বলবেন মা শুনলে? বললেন, দীপু তুমি এমন অলস হ'লে। অমন একজন পণ্ডিত সম্মানীয় মানুষকে খাটিয়ে নিলে! একটু লজ্জা করলো না তোমার?

দীপু মাথা নাড়ে। সে খাবে না কিছুতেই খাবে না দুধ। বলে, আপনি ব্যস্ত হবেন না। কান্না আসুক ও সব করে দেবে।

পাগল, বলেন অবনীবাবু। তোমার মত ছেলের জন্য কি না করা যায়? তোমাকে আমি নিজে দেখবো। হাতে কলমে শেখাবো। তোমার মত একটি ছেলের কে না স্বপ্ন দেখে।

সন্ধ্যার পরে কান্নার সঙ্গে আসে আর সবাই।

দীপু অবাক হয়ে যায় এক সঙ্গে এত মানুষ দেখে। পর পর চারটে তাঁবু খাটানো। যাঁরা এসেছেন সবাই এক এক বিষয়ে পণ্ডিত। দীপুর জ্ঞান ফিরেছে শুনে সবাই খুশী। কান্না নিয়ে এসেছে দীপুর ফেলে আসা থলেটা। সে কাউকে দেয়নি থলেটাকে নিতে। দীপুর জিনিষ দীপুকে দিয়ে তবে তা'র শান্তি।

অবনীবাবু নিজের হাতে ব্যাগ খুললেন। বেরুলো টর্চ, জমানো দুধ, বিস্কুটের কৌটো, ছুরি আরো কত কিছু। সবার শেষে বের হ'ল ক্যামেরা।

মিঃ সরকার বললেন, যা দরকার সব গুলোইতো আছে দেখছি।

অবনীবাবু মুখ তুলে বললেন, পাকা আবিষ্কারক। দীপু জানে এ রকম অভিযানে কি কি চাই। খুব অবাক হচ্ছেন না মিঃ সরকার।

অবাক হব না! মিঃ সরকার দীপুর দিকে তাকান। ওহে তোমাকে মাথায় তুলে নাচতে ইচ্ছে হ'চ্ছে আমার।

হাসলেন অবনীবাবু। বললেন, আপনি সত্যি তাই করে বসবেন না। বুঝলেন ছেলেটা এখনো অসুস্থ।

সেটাই তো অসুবিধা করছে। বললেন মিঃ সরকার। নয়তো ওকে নিয়ে চরকীর কত পাক খেতাম আমি।

দীপু মুখ লুকিয়ে নেয় লজ্জায়।

পরের দিন সকালেই এলেন দীপুর বাবা। এ ক'দিনে কিরকম শুকিয়ে গেছেন। দীপুর মা আসেন নি। তিনি বিছানায় শুয়ে আছেন। দীপুকে না পেয়ে সেই যে বিছানায় শুয়ে পড়েছেন আর ওঠেন নি। শুধু শুয়ে শুয়ে কেঁদেছেন। আর বার বার চমকে উঠেছেন। পায়ের শব্দ শুনলেই ভাবতেন এই বুঝি দীপু এল। গভীর ঘুমের মধ্যে কতবার চমকে উঠেছেন। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দীপুর ডাক শুনতে পেতেন। লাফিয়ে উঠে বসতেন বিছানায়। সিঁড়ি বেয়ে দ্রুত নেমে আসতেন নিচে। হুট করে দরজা খুলতেন।

কোথাও কেউ নেই। জনমানবহীন রাস্তা যেন শ্মশানের মত নিঃস্তব্ধ। বেদনায় মূক। ঘুমিয়ে আছে। আলোগুলো যেন প্রাণ-হীন। টিম টিম করে জ্বলছে। রাস্তার বুকের ওপর ল্যাম্প পোষ্টের লম্বা ছায়া। থেকে থেকে হাওয়া আসছে। আর কিছু নেই।

সারা রাত দরজায় ব'সে থাকতেন দীপুর মা। দীপুর বাবা টের পেলে উঠে আসতেন। বলতেন, ও রকম বাইরে বসে থাকলেই ছেলে ফিরবে না। ভেতরে চল।

দীপুর মা উঠতে চাইতেন না। ছেলেমানুষের মত জেদ ধরতেন। বলতেন, দীপু আজ আসবে। আমার মন বলছে সে আসবে। আমি শুনতে পাচ্ছি তার পায়ের শব্দ। কত দূর থেকে যেন আসছে আমার বাছা। এই রাত্রে ট্রাম বাস কিছু নেই। কত পথ যেন হেঁটে আসতে হচ্ছে বাছাকে।

দীপুর বাবাকে খুব ক্লান্ত উদাসীন মনে হয়। সবাই অভিনন্দন জানায়। কলের পুতুলের মত হাত জোড় করেন। সবাই তা'কে চাঙ্গা করতে চায়। অবনীবাবু বলেন, আপনি ভাগ্যবান পুরুষ নয়তো এমন ছেলে পাওয়া যায়!

দীপুর বাবা ম্লান হাসেন। মুখে কিছু বলেন না। দীপুর গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকেন। বলেন, ইস্, কি রোগা হয়ে গেছিস। দীপু তোমাকে দেখতে না পেলে তোমার মা বাঁচবেন না।

বাবার কথা শুনে কান্না আসে দীপুর। ইচ্ছে হয় ছুটে গিয়ে

ঝাঁপিয়ে পড়ে মায়ের কোলে। আকুল হয়ে মাকে ডাকে মা-মাগো—কিন্তু কোলকাতা এখান থেকে যে অনেক দূরে। তাই ছল ছল চোখে তাকিয়ে থাকে দূরের পানে। কোন কথা বলতে পারে না দীপু।

সন্ধ্যা হ'তে সবাই বসে বাইরে চেয়ার পেতে। দীপু অসুস্থ ব'লে তা'কে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে ইজি চেয়ারে। তা'র খুব লজ্জা করছে এতগুলো মানুষের সামনে ইজি চেয়ারে শুয়ে থাকতে। কিন্তু তা'কে উঠতে দিতে চাইছে না কেউ। আহা, এখনো সুস্থ হয়নি ছেলেটি এমনি ভাব সবার মুখে।

সন্ধ্যা না হ'তেই জ্যোৎস্না উঠেছে। এখান থেকে টাল খেয়ে উপত্যকা নেমে গেছে দূর দিগন্তে। কাছাকাছি কোন গ্রাম নেই। দু'একটা গাছ চোখে পড়ে। জ্যোৎস্নার আলোতে সব অপার্থিব মনে হয়।

দীপুর বাবা বলেন, আপনারা যে বলছেন এখানে লুপ্ত জীবজন্তুর প্রচুর জীবাশ্ম পেয়েছেন। এত বেশি পাওয়ার কারণ কি। আমার তো ধারণা ছিল এসব মূল্যবান নিদর্শন খুব কম পাওয়া যায়।

অবনীবাবু হেসে বললেন, আপনি সঙ্গত প্রশ্ন তুলেছেন। এর দুটো কারণ আমারা আপাতত অনুমান করছি। এক হ'তে পারে কর্দমাক্ত জলা ভূমিতে যেমন বিপন্ন জীবজন্তুর মৃত্যু হ'তে পারে তেমনি আবার বিষাক্ত বাষ্পের ফলেও এরকম দলগত মৃত্যু ঘটাতে পারে।

অবনীবাবু থামলেন না। বললেন, এখানকার সব থেকে তাৎপর্য হ'ল ডিম্বাকৃতি সূক্ষ্মাগ্র আদিম আয়ুধ। ঠিক এমনি পাথুরে অস্ত্র পাওয়া গেছে কাশ্মীরের সোহান উপত্যকায়। এ আবিষ্কার খুব তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা কংসাবতী, দ্বারকেশ্বর, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদীর উপত্যকায় আদিম মানুষের তৈরী অনেক পাথুরে অস্ত্র পেয়েছি।

এটা আজ প্রমাণিত যে শুশুনিয়ার উপলাস্তীর্ণ উপত্যকায় আজ থেকে এক লক্ষ বছর আগে থেকেই বাস করতে সুরু করেছিল প্রাচীন মানব গোষ্ঠী। হাতিয়ার তৈরীতে তা'রা যথেষ্ট নিপুণতার পরিচয় দিয়েছে। দীপু যে হাত-কুঠারটি সংগ্রহ করেছে সেটি খুব মূল্যবান। প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা ছিল হাত-কুঠার মধ্য ও দক্ষিণ ভারত, আফ্রিকা

ও ইউরোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু শুশুনিয়ায় প্রচুর হাত-কুঠার আবিষ্কার হওয়ার ফলে এতদিনের প্রত্নতত্ত্ববিদের ধারণা পাল্টে যাবে।

দীপুর বাবা বললেন, পৃথিবীতে কত কিছু জানবার বিষয় আছে। অথচ আমরা কোন খোঁজ রাখিনা।

অবনীবাবু হেসে বললেন, দীপু কিন্তু রাখে। ওকে দেখে আমি অবাক মেনেছি। কেমন ক'রে এমন একটা ধারণা ওর মাথায় এল আমি বুঝতে পারিনে। ওকে একজন ঝানু প্রত্নতাত্ত্বিক ব'লে মনে হয় আমার। হ্যাঁ, এটা আজ প্রমাণিত যে আদিম মানুষের বিবর্তনের একটি অধ্যায় শুশুনিয়ায় ঘটেছে। অবশ্য তাদের আমাদের মত মানুষ বলে ভাবলে ভুল করবেন। তা'রা পুরো মানুষ ছিল না। কিন্তু পাথরের পাত খসিয়ে অস্ত্র তৈরী ক'রে তা'রা পরিপূর্ণ মানুষ হবার দিকে যাত্রা করেছিল। সেই যাত্রা পথের নানা ইতিহাস আমরা খুঁজে পেয়েছি শুশুনিয়ার উপত্যকায়।

দীপু তাকিয়ে ছিল দূরের দিকে। জ্যোৎস্নায় শুশুনিয়ার প্রান্তর তখন অপরূপ। সে যেন দেখতে পেল দূর-দূরান্ত থেকে কয়েকটি মানুষ এগিয়ে আসছে তা'র দিকে।

ঘুম এসে যায় দীপুর। অবনীবাবু কি বলছেন আর শুনতে পায় না। সে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে শুশুনিয়ার আদিম মানুষের। বেঢপ তাদের চেহারা। সামনের দিকে একটু ঝুঁকে চলেছে কয়েকটি মানুষ হাতে তাদের পাথুরে অস্ত্র। গাছের আড়ালে আড়ালে নদীর পাড় দিয়ে তা'রা সন্তর্পণে চলেছে শিকারের পিছনে পিছনে। এ মানুষগুলো হয়তো পিথেকান্থ্রোপাস্ অথবা সিনান্থেথ্রোপাস মানুষের কোন উত্তরাধিকারী।

পরের দিন সকালেই দীপুকে নিয়ে যাত্রা করেন তা'র বাবা। দীপু কান্নাকে ছেড়ে যেতে রাজী হয় না। জেদ ধরে কান্নাকেও নিয়ে যাবে সঙ্গে করে। ছেলেটার বড় কষ্ট। মা বাবা কেউ নেই। খুড়োর সংসারে থাকে। গরু-বাছুর রাখে তাই দু'বেলা অন্ন জোটে। কোথাও চলে গেলে খুঁজে দেখে না কেউ। কান্নাকে সঙ্গে নিয়ে যাবে

দীপু। স্কুলে পড়বে কান্না। ভবিষ্যতে আবার যখন সে বড় অভিযানে বের হবে কান্না হবে তা'র সঙ্গী

শেষ পর্যন্ত তাই হ'ল। কান্না এক কথায় রাজি। ছোঁ মেরে মাটি থেকে তুলে নিল তা'র তীর ধনুক। এই মুহূর্তেই সে রাজি ট্রেনে চেপে বসতে।

সবাই স্টেশন পর্যন্ত এগিয়ে এলো ওদের বিদায় দিতে। অবনীবাবু বললেন, কোলকাতায় গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করবো দীপু। আমি নিজে তোমাকে প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাস শেখাব। প্রত্নতত্ত্বের আবিষ্কারের করণ-কৌশল শিখিয়ে দেবো।

ট্রেনে উঠে দীপুর বাবা বললেন, এমনি না বলে চলে আসে ?

বাঃ, বললে তোমরা আসতে দিতে ? দিতে না বাবা।

না, দিতাম না, দীপুর বাবা বললেন। এবার থেকে দেবো। তোমার কোন কাজে আর বাধা দেবো না আমি।

একটু সময় চুপ ক'রে থাকেন দীপুর বাবা। তারপর বলেন, এবার পূজোর সময় আমরা শুশুনিয়া আসবো। তোমার মাও থাকবেন। আমরা শুশুনিয়া ভালো ক'রে খুঁজে দেখবো আরো কিছু পাওয়া যায় কিনা।

বাবা, কান্নাও থাকবে আমাদের সঙ্গে, দীপু বললো।

দীপুর বাবা হেসে বললেন, থাকবে বৈকি। নয়তো কে আমাদের পথ দেখাবে।

ট্রেন এসে হাওড়া স্টেশনে ঢুকলো। তিনজনে বাইরে এল। দীপুতো অবাক। তাদের স্কুলের হেডমাষ্টারমশাই দাঁড়িয়ে আছেন। সঙ্গে আছেন অন্য মাষ্টারমশাইরা। স্কুলের কয়েকজন ছাত্রও আছে। তা'রা অবাক বিস্ময়ে দীপুকে দেখছে।

দীপু প্রণাম করতেই বুকে জড়িয়ে ধরলেন হেডমাষ্টারমশাই। বললেন, ওরে ফুলের মালা পরিয়ে দে ওর গলায়। দীপু আমাদের বুক এত চওড়া ক'রে দিয়েছে।

কান্নাও মালা পেল। তাড়াতাড়ি সরে এল ছেলেদের কাছ থেকে। দীপুর গায়ের কাছে এসে দাঁড়ালো।

দীপুর দাছ ভিড় ঠেলে এলেন সামনে। তাড়াতাড়ি চোখ থেকে চশমা নামিয়ে মুছতে লাগলেন বার বার। তবু ছাই তার চশমাটা ঝাপসা হয়ে যায়। বললেন, দাছ একটু ঠিক হয়ে দাঁড়াতো ভাল ক'রে দেখি। গাল টিপে দিলেন দীপুর। কান ধ'রে বললেন, এই নাও তোমার পুরস্কার।

দীপু দেখলো তা'র দাছর হাতে ঝুলছে একটা বেশ দামী ক্যামেরা।

কিন্তু মা! মা কোথায়! দীপুর আকুল চোখ চারদিকে মাকে খোঁজে। মাকে দেখতে না পেয়ে কান্না পায় তা'র। বুকটা যেন শূন্য হয়ে যায়, ইচ্ছে হয় চীৎকার করে মাকে ডাকে—মা—মাগো—

গাড়ীতে উঠল ওরা। মাঝখানে বসলেন দীপুর দাছ। ছ'পাশে বসলো কান্না আর দীপু। জাপটে ধ'রে বসে রইলেন বুড়ো মানুষটি। এমনভাবে জাপটে রইলেন যেন আবার না হারিয়ে যায়।

পথ যেন আর শেষ হয় না। গাড়ী চলছে তো চলছে। আর নিজেকে ধরে রাখতে পারে না দীপু। মনে হয় যেন কত কতদিন হ'ল মাকে সে দেখেনি।

গাড়ী এসে দাঁড়ালো দীপুদের বাড়ীর সামনে। দরজার উপর বসে আছেন দীপুর মা। কতদিন যেন চুলে তেল পড়েনি। মুখ শুকিয়ে গেছে। চোখ ভিতরে বসে গেছে। ঠোঁট বিবর্ণ। তাকিয়ে রয়েছেন দূরের দিকে।

মাকে জড়িয়ে ধরল দীপু। কেঁদে দিল সেই মুহূর্তে, মা-মাগো—

প্রথমে যেন বিশ্বাসই করতে পারলেন না দীপুর মা। অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। আস্তে আস্তে হাত বোলাতে লাগলেন চুলে। অনেকক্ষণ পরে বললেন, দীপু ফিরে এলি?

—হ্যাঁ-এইতো আমি। ঝর ঝর করে কেঁদে দিল দীপু।

কাঁদিসনে বললেন দীপুর মা। না খেয়ে আমার বাছার মুখখানি শুকিয়ে গেছে। ওরে তোরা কে আছিস—ওরজন্য খাবার আন—

দাঁড়িয়ে থাকা মেয়েরা আঁচল তুলে চোখ মোছে। ভদ্রলোকেরা চোখের জল গোপন করতে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। বলে, সত্যি ছেলের মত ছেলে, এমন ছেলে হাজরে হাজার হয়না কেন এ দেশে।